চাঁদমামা

মে ১৯৭৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Photo by : **SURAJ N. SHARMA**

DANCER FROM MYSORE

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ডলটন্ এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

ক্রীম ক্র্যাকার

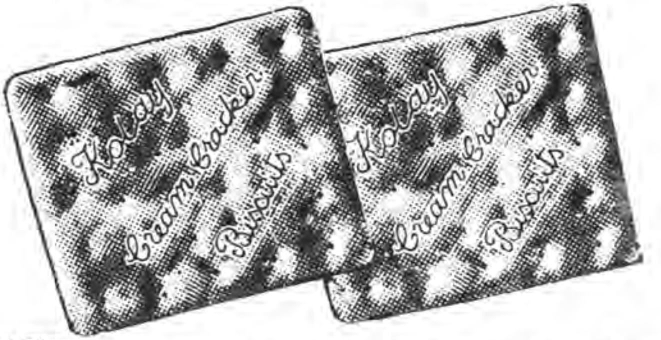

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলি-১০

WIN any one of the 5 (Five) Cheques already drawn and kept in sealed covers in the custody of Canara Bank, Bangalore, by guessing the Cheque amount correctly. Fill in the Coupon below and mail your entry to the NATIONAL PRODUCTS, 135, Kaval Byrasandra, Bangalore-560006.

If there are no correct entries the nearest guess wins the prize. If there are more than one successful entries the Cheque amount will be shared amongst them.

You can send any number of entries as you desire but every entry form must be accompanied by 10 (ten) empty wrappers of NP Crackies Strip pack.

Entries close on May 31, 1974 and the result will be published in The July Issue of Chandamama.

NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED AND THE DECISION OF THE NP MANAGEMENT IS FINAL.

NP-MAC(B)

CUT HERE

NO ENTRY FEE

NP CRACKIES CONTEST ENTRY FORM • LAST DATE 31-5-1974

Prizes	Cheque Numbers	Amount of the cheque is between	FILL IN Your guess of the cheque amount Rs.	P
I	508183	Rs. 1501 and 2000		Nil
II	508184	1001 and 1500		Nil
III	508185	751 and 1000		Nil
IV	508186	501 and 750		Nil
V	508187	251 and 500		Nil

Name ______________________ Age ______

Address: ______________________

____

Date __________ Signature of the contestant __________

Fill in ink legibly

Corrections and overwritings disqualify the entries.

Contest strictly governed by the rules and regulations laid down.

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সীস, **চাঁদমামা বিল্ডিংস,** মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

একমাত্র রুবি ডাস্ট চায়েই আপনি পাবেন একাধারে তিনটি গুণ
১. চটপট লিকার
২. চমৎকার স্বাদগন্ধ
৩. প্রতি প্যাকেটে ঢের বেশি কাপ চা
RUBY DUST Superb Teas SELECTED FOR STRENGTH AND FLAVOUR
RUBY DUST
লিপটনের রুবি ডাস্ট—গুঁড়ো চায়ের রাজা, কেন না শুধুমাত্র এই চায়েই আপনি পাচ্ছেন কম পয়সায় কড়া স্বাদে-গন্ধে ভরা অঢেল চা।
যেমন চমৎকার স্বাদগন্ধ, তেমনি কড়া লিকার।
লিপটন বলতেই ভালো চা
LIPTON
লিপটনের রুবি ডাস্ট আপনাকে দেবে ঢের বেশি কাপ ভালো চা
LRDC-10 BEN

everest/508b/PP BN

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথার বিষয়বস্তু 'পরিবেশের প্রভাব।' বাস্তব অবস্থার সঠিক বিচার না করে যদি কোন রাজা সমস্যার সমাধান কবতে চায় তাহলে তার পরিণাম যে কি হয় তা 'ক্ষুধার ওষুধ' কাহিনীতে পরিবেশিত হয়েছে।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতায় অনেক পাঠক-পাঠিকা খামে অথবা ইন্ল্যাণ্ডে ফটো-নামকরণ লিখে পাঠাচ্ছেন। ফলে সেগুলো বাতিল হচ্ছে। কারণ ফটো-নামকরণ শুধু পোষ্ট কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে।

খণ্ড ২   মে ১৯৭৪   সংখ্যা ১১

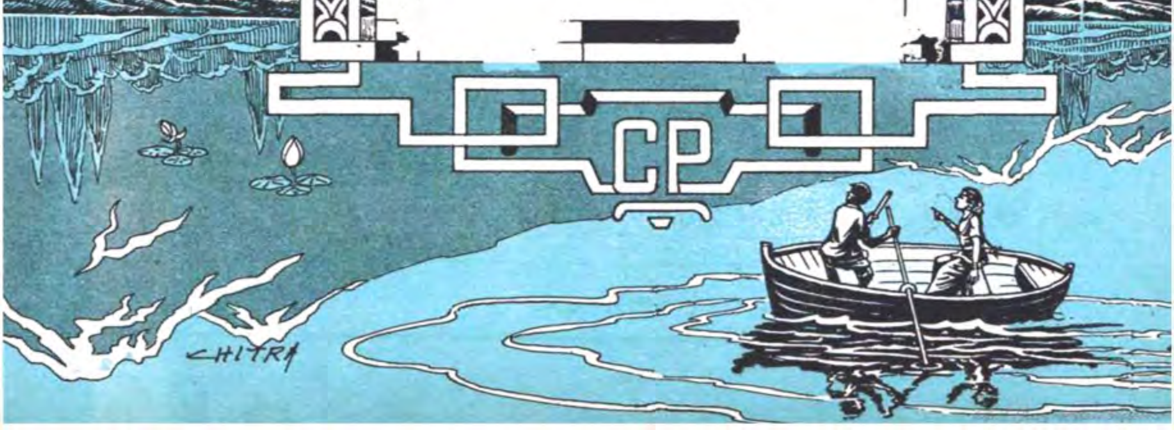

অমর বাণী

পিবন্তি নদ্য স্স্বয়মেব নাম্ভঃ,
খাদান্তি ন স্বাদু ফলানি বৃক্ষাঃ,
পয়োধরা সসস্য মদন্তি নৈব
পরোপকারায় সতাম বিভূতয়ঃ ॥ ॥ ১ ॥

[নদীসমূহ কখনও নিজেদের জল নিজেরা পান করে না, বৃক্ষ নিজের ফল নিজে খায় না, মেঘ (নিজের সৃষ্ট) ফসল খায় না। একই ভাবে উত্তম ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি পরের উপকারের জন্য খরচ করেন।]

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তম্ গ্রন্থকোটিভিঃ
পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্ ॥ ॥ ২ ॥

[বহু গ্রন্থে প্রকাশিত বক্তব্যকে আমি অর্দ্ধেক শ্লোকে প্রকাশ করছি। পরোপকার করলেই পুণ্য হয়, পরকে পীড়ণ করলে পাপ হয়।]

আত্মার্থম জীবলোকেস্মিন্ কো ন জীবতি মানবঃ ?
পরম পরোপকার্থম্ যো জীবতি স জীবতি ॥ ॥ ৩ ॥

[এই জগতে এমন কে আছে যে নিজের জন্য বাঁচতে চায় না ? কিন্তু পরের উপকার করার জন্য যে বাঁচে তার জীবনই সার্থক।]

পরোপকার

যক্ষপর্বত

বাইশ

[গুরু-ভালুকের শিষ্যদের কথায় বীরপুরের সেনাপতি তার সেপাইদের নিয়ে দুর্গে ঢুকল। সেই সুযোগে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গে ঢোকার পথে আগুন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে বীরপুরের সেনাদের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিতে হুকুম দিল। তারপর···]

বীরপুরের সেনাপতি সেনাদের নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে শত্রুদের খোঁজ করছিল। এমন সময় শুনতে পেল জীবদত্তের হুঁশিয়ারি। শোনা মাত্রই সে হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই সে দেখতে পেল সুড়ঙ্গে সে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সে পথ দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে। সেনাপতি ও তার সেপাইরা সুড়ঙ্গের প্রত্যেকটি ঘরে ঢুকে দেখল। কিন্তু শত্রুপক্ষের কাউকে তারা দেখতে পেল না। সব মিলিয়ে তিনটি মরা নেকড়ে, কয়েকটা চামড়া ও তরবারি ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখল।

তাজ্জব ব্যাপার। অবাক কাণ্ড। রেগে-মেগে সেনাপতি তার সেনাদের হুকুম দিল, বনের ভালুক জাতের যে দুটো যুবক আমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের এক্ষুনি

এখানে ধরে নিয়ে এসো। ওরা আমাদের নেকড়েদের সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

দুজন সৈনিক গুরু—ভালুকের শিষ্য দু-জনকে ধরে সেনাপতির সামনে হাজির করল। সেনাপতি ঝট করে তরবারি বের করে বলল, "পাজি বদমাইশ কোথাকার, তোমরা আমাদের ধোকা দিয়েছ। এখানে আমাদের শত্রু কোথায়? এখনও শেষ বারের মত বলে দিচ্ছি সত্যি কথা বল। তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের এই তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব।"

ভালুকের শিষ্যরা সেনাপতির কথায় একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, "আমরা আমাদের গুরুর নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। আর পালন করতে পেরেই আমরা খুশী। এখন মরে গেলেও আমাদের কোন দুঃখ নেই।" তারপর ওরা সুড়ঙ্গে ঢোকার পথের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি শুনতে পাননি? ক্ষত্রিয় যোদ্ধা খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত আপনাদের হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। ওদের কথা মত কাজ না করলে আপনারা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। এই যে, ও সেনাপতি, সম্মান দিয়ে কথা বলছি বলে কানে যাচ্ছে না, না? ধোঁয়া ঢুকছে টের পাচ্ছ না? মরার খুব সাধ, না? এখনও সময় আছে কোন্ পথে যাবে বেছে নাও। মরার পথে না বাঁচার পথে!"

সেনাপতি ভাবল, ক্ষত্রিয় যুবক আবার কারা? ওদের সম্পর্কে তো কিছু জানা হল না? আগে ওদের সম্পর্কে জেনে নি। ওদের সঙ্গে সমরবাহুর কি ধরণের সম্পর্ক তাও জানা দরকার। কিন্তু এত কথা কায়দা করে জানার সময় কোথায়। ইতিমধ্যে আগুনের হল্‌কা দেখে বীরপুরের সেপাইরা পরস্পরকে ধাক্কা মেরে ছোটাছুটি করতে লাগল। ওদের ছোটাছুটি দেখে সেনাপতি ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে।

বীরপুরের সেনাপতির আর কোন সন্দেহ রইল না যে সে এক বিরাট বিপদে পড়ে গেছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে

বাঁচার একটি মাত্র পথই আছে। আর তা হল হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করা। তারপর সে নিজের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে তার নিজের সেপাইদের নির্দেশ দিল তারাও যেন হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেয়। সেপাইরা তাই করল। সেনাপতি সুড়ঙ্গের মুখে এসে চিৎকার করে বলল, "হে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণ, আমি বীরপুরের সেনাপতি বলছি, আমি এবং আমার সেনারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করছি। আপনারা আগুন নিবিয়ে ফেলুন।"

সেনাপতির কথা খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত শুনতে পেল। ওরা ভালুক জাতের লোককে জ্বলন্ত কাঠ সরিয়ে নেভাতে বলল। ওরা তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত কাঠ সরিয়ে নিভিয়ে দূরে ফেলে দিল। তারপর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গের মুখে উঁকি মেরে দেখল। ধোঁয়ায় গোটা সুড়ঙ্গটা ভরে থাকায় ওরা তেমন কিছুই দেখতে পেল না। আরও এগিয়ে ওরা দেখতে পেল বীরপুরের সেনাপতি ও সেনাদের।

"খড়্গবর্মা, মনে হচ্ছে সেনাপতি মিথ্যা কথা বলেনি। ওকে ডেকে দেব?" জীবদত্ত বলল।

খড়্গবর্মার কোন জবাব দেবার আগেই গুরু-ভালুক তাড়াতাড়ি সেখানে এসে জীবদত্তকে বলল, "মশাইরা, রাজা আর তার সেবকদের কথায় বিশ্বাস করবেন না। আগে আমার শিষ্যদের ডেকে এনে, ওদের কাছে আসল ব্যাপার জেনে নিন। তারপর যা করার করবেন। সেটাই ভাল হবে।"

"কুটিলদের চাল কুটিলরাই ধরতে পারে।" বলে হাসতে হাসতে জীবদত্ত বলল, "ঠিক আছে ভালুক, তুমি তোমার শিষ্যদের আগে ডেকে নাও। এখানে আসতে বল ওদের।"

গুরু-ভালুক হাতের বল্লমটিকে উপরে তুলে বলল, "বৃকেশ্বরী মায়ের জয়।" তার চিৎকার যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল। তারপর সে আবার চিৎকার করে

বলল, "ওহে শিষ্যগণ, তোমরা আগে উপরে উঠে এসো। বীরপুরের লোককে এখন ওখানেই থাকতে বল।" পরে সে সমর-বাহুর দিকে চোখের ইশারা করে বলল, "এ হলো আমাদের এখানকার পাহাড়ী দুর্গের মহারাজা সমরবাহুর নির্দেশ।"

নিজেদের গুরুর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভালুক শিষ্য দুজন সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গের বাইরে চলে এল। এই অবস্থা দেখে বীরপুরের সেনাপতি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সে একজন রাজা, দুজন ক্ষত্রিয় যুবক ও কয়েকজন ভালুক জাতের লোকের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। সে ভীষণ ঘামতে লাগল। তার সমস্ত গা দিয়ে তর তর করে ঘাম ঝরতে লাগল। বার বার ভাবতে লাগল তাদের মধ্যে একজনও যদি চটে যায় তাহলে তার গর্দান যাবে। ভাবতে ভাবতে বীরপুরের সেনাপতির শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসছিল।

ভালুকের শিষ্যরা খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে সুড়ঙ্গের ভেতরের অবস্থা সবিস্তারে জানাল। ওরা যে সত্যি সত্যি হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়েছে তা জানতে পারল। সব জেনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সেনাপতি প্রভৃতিদের বাইরে আসতে বলল। আর নিজেদের কাছে যারা ছিল তাদের অস্ত্র হাতে প্রস্তুত থাকতে বলল।

বীরপুরের সেনাপতি খড়গবর্মা ও জীব-দত্তকে সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিয়ে জীবদত্ত সমরবাহু-কে দেখিয়ে তাকে বলল, "ইনি হলেন এই অঞ্চলের রাজা। চন্দ্রবংশের লোক। নাম সমরবাহু। ইনি তোমাদের বুদ্ধি ও সৈন্য-বলে পরাজিত করেছেন। এঁর অধীনেই তোমাদের থাকতে হবে। বুঝতে পেরেছ?"

বীরপুরের সেনাপতি মাথা নুইয়ে সমর-বাহুকে প্রণাম করল। তাকে অনুসরণ করে অন্য সেপাইরাও সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এল। সমরবাহু ওদের সবাইকে একটা ছোট্ট ময়দানে দাঁড়াতে বলে রাজার মত সদম্ভে সে স্বর্ণাচারিকে জিজ্ঞেস করল,

“মহামন্ত্রী, আমরা এই শত্রুদের কি ধরণের শাস্তি দিতে পারি ?”

স্বর্ণাচারি কিছুক্ষণ ভেবে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে সমর–বাহুকে বলল, “মহারাজ, এদের কি ধরণের শাস্তি দেব তা নির্ভর করছে বীরপুরের রাজা আমাদের সঙ্গে কি ধরণের আচরণ করবেন তার উপর। এখন আমাদের কর্তব্য হবে এদের কোন শাস্তি না দিয়ে হাতে রাখা। এদের আমরা এখন আমাদের পাহাড়ী দুর্গে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখতে পারি।”

“খুব ভাল কথা। তুমি আমাকে চমৎকার পরামর্শ দিয়েছ মহামন্ত্রী।” সমরবাহু খুশী হয়ে স্বর্ণাচারিকে বলল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সমরবাহুর গুরু–গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল। একজন লুণ্ঠনকারীর মধ্যে অদ্ভুত রকম রাজার ভাবমূর্তি এসে গেছে। রাজার মতই চলন বলন হয়েছে। এসব বিষয় খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে মজার ছিল।

খড়্গবর্মা জীবদত্তের কানে কানে বলল, “ছোটখাট একটা অঞ্চল দখল করাতে পারলে একজন লুণ্ঠনকারীর মধ্যে যে এতটা পরিবর্তন এত অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা দেবে আমি তা ভাবতে পারিনি।”

“আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। শেষে আমরা দুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করে

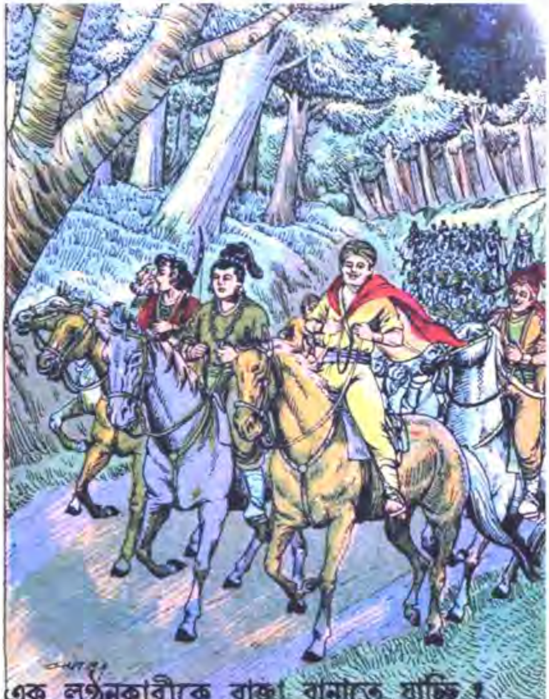

এক লুণ্ঠনকারীকে রাজা বানাতে যাচ্ছি ?

ইতিমধ্যে বীরপুরের রাজা নিশ্চয় আমাদের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গেছে। নিশ্চয় সে ভয় পেয়েছে। কারণ একজন রাজার সেনাপতি যখন ধরা পড়ে তখন রাজার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশ্চয় এই অবস্থায় রাজাকে সাহায্য করতে আসবে না। এটা নিশ্চিত যে সমরবাহু এই পাহাড়ী দুর্গকে কেন্দ্র করে এখানকার রাজা হিসেবে থেকে যেতে পারবে। আর কোন বাধা নেই সামনে।” জীবদত্ত বলল।

কিছুক্ষণ পরে সমরবাহু খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে এসে বলল, “হে ক্ষত্রিয়

যোদ্ধাগণ, আপনাদের পরামর্শ চাই। এখন কি পাহাড়ী দুর্গে যেতে পারি ?”

“রাজার আদেশ কেউ অবহেলা করতে পারে ? যাওয়া যাক।” জীবদত্ত বলল।

উট ও ঘোড়ায় চড়ে সমরবাহুর কয়েক-জন অনুচর সামনে আর কয়েকজন পিছনে চলতে শুরু করল। বীরপুরের বন্দী সেপাইদের মাঝখানে রাখা হল। কয়েকটা উট ও ঘোড়ায় কয়েকজন চড়ল। ওগুলোকে হাঁটাতে হাঁটাতে গুরু-ভালুকের লোক গুরুর পিছনে পিছনে যেতে লাগল। সমরবাহু, স্বর্ণাচারি, খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সবার সামনে ছিল। সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ী দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছাল।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল একটু উঁচু জায়গায় এক বৃদ্ধকে ঘিরে কয়েকজন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তারা তাদের আসার খবর আগে থেকে পেয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

“সমরবাহু, একি ব্যাপার ? মনে হচ্ছে বীরপুরের রাজা নিজেই তোমার মাথায় মুকুট পরাতে এসেছেন।” জীবদত্ত বলল।

সমরবাহু জীবদত্তকে কি যেন বলতে যাবে এমন সময় বৃদ্ধ এগিয়ে এসে প্রসন্ন মুখে তাদের দিকে তাকাল। বৃদ্ধের দু-পাশে দুজন অনুচর ছিল। বৃদ্ধ কাছে এলে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ভদ্রতাবশত ঘোড়া থেকে নাবল।

বৃদ্ধ তাদের দিকে তাকিয়ে শান্তির সঙ্কেত দেখিয়ে বলল, “আমি বীরপুরের রাজার মন্ত্রী। আমাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে যে বর্ণনা পেয়েছি তা যদি সত্য হয় তাহলে আপনারাই খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত।”

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বৃদ্ধকে নমস্কার করল। তারপর জীবদত্ত মন্ত্রীকে বলল, “মহামন্ত্রী, আমাদের বিষয়ে গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনেক খবর পেয়েছেন। আর আমরাও অনেকদিন ধরে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা এত কষ্ট করছেন কেন ? কোন্ প্রয়োজনে ?” বলে জীবদত্ত পিছনের দিকে ঘুরে সমরবাহুকে দেখিয়ে

আবার বলল, "ইনি হলেন এই পাহাড়ী দুর্গের রাজা সমরবাহু আর ইনি এঁর মহামন্ত্রী।"

ওদের নাম শুনে মহামন্ত্রী মুখ ঢেকে পরমুহূর্তে মুচকি হেসে বলল, "মাত্র কিছুক্ষণ আগে গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আপনি অপূর্ব কৌশলে আমাদের সেনাপতি ও সেপাইদের সুড়ঙ্গে আটকে ফেলেছেন। আপনার কাছেই আমি আমার রাজার একটি নির্দেশ নিয়ে এসেছি। আমাদের রাজা আপনাকে এই দুর্গে রাজত্ব করতে সানন্দে বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্য বিশেষ করে এসেছি এই যুবক দুজনের কাছে একটি গোপন খবর দিতে। আপনারা অনুগ্রহ করে একটু আড়ালে আসবেন?"

তারপর জীবদত্ত সমরবাহু ও স্বর্ণাচারিকে বলল, "তোমরা বীরপুরের রাজার মহামন্ত্রীর কথা শুনলে তো? এখন উঠে পড়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলের শাসন কাজে হাত দাও। আমার ধারণা এখন বীরপুরের সেনাপতি ও সেনাদের ছাড়ার বিষয়ে তোমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

সমরবাহু স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। স্বর্ণাচারি বীরপুরের মহামন্ত্রীকে বলল, "মহামন্ত্রী, আপনার রাজা প্রস্তুত হয়ে আর একবার যে আমাদের উপর

আক্রমণ করবেন না তার কি কোন প্রমাণ আছে।"

"আমাদের রাজা আপনার রাজাকে জানাতে বলেছেন যে কোন দিনই আপনাদের উপর আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হবে না। আমাদের রাজা মুখে যা বলেন কাজেও তাই করেন।" বীরপুরের মন্ত্রী বলল।

এই জবাবে সমরবাহু খুব খুশী হল। তার আদেশে বীরপুরের সেনাপতি ও সেপাইরা মুক্ত হল। ওরা আনন্দে হৈচৈ করতে করতে নিজেদের মহামন্ত্রীকে প্রণাম করল। কয়েকজন সমরবাহু ও স্বর্ণাচারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

এত অল্প পরিশ্রমে যে রাজা হয়ে যেতে পারবে তা সমরবাহু কোনদিন ভাবতেও পারে নি। তাই খুব খুশী হয়ে সে বীরপুরের সেনাদের বলল, "আজ তোমরা সবাই আমার অতিথি। কাল সকালে তোমরা সবাই যাবে রাজধানীতে।"

তারপর সমরবাহুর অনুচর, ভালুক দলের লোক ও বীরপুরের সেনারা গল্প-গুজব করে গাছের নিচে খোশ মেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে বীরপুরের মহামন্ত্রী খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে তাদের বলল, হে বীর যোদ্ধাগণ, আপনাদের বিষয়ে আমি যে শুধু আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমেই জেনেছি তাই নয়; কাল রাত্রে এক যক্ষের কাছ থেকে আপনাদের সম্পর্কে আরও অনেক অজানা কথা জেনেছি।"

"যক্ষের কাছ থেকে! কে সেই যক্ষ?" জীবদত্ত অবাক হয়ে খড়্গবর্মাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা খড়্গবর্মা, এই কি সেই যক্ষ যে পদ্মপুরের রাজকুমারী পদ্মাবতীকে অপহরণ করে পালিয়েছে?"

প্রশ্ন শুনে খড়্গবর্মাও বিস্মিত হল। বীরপুরের মহামন্ত্রী ওদের অবস্থা লক্ষ্য না করে এগিয়ে গেল। একটু এগিয়ে একটি টিলার উপর উঠে দূরে তর্জনী দেখিয়ে বলল, "বীরগণ ঐ যে নদীর বুকে একটি নৌকা দেখা যাচ্ছে, আপনারা সেদিকে তাকান।"

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সেই নৌকার দিকে তাকাল। শিলারথের আকৃতি তার। এই রথের বিষয়ে শুনেছে ওরা পদ্মপুরে। অরণ্যপুরে দেখেছেও। জীবদত্ত উৎসাহিত হয়ে দণ্ড উঁচিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এত দিন পরে প্রস্তুত হয়ে এই যক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। ভালই হল। আমরাও আমাদের শক্তির পরিচয় দিতে পারব।" বলে জীবদত্ত নদীর দিকে এগিয়ে গেল। (আরও আছে)

পরিবেশের প্রভাব

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এসে, গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মত নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি সত্যি সত্যি প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করতে বদ্ধ-পরিকর দেখছি! কারো কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে তুমি নিজেই একাজ করতে এগিয়ে এলে। নীলদত্তও একা এগিয়েছিল। কিন্তু বাধা পেয়ে হতাশ হল। সে ভারী মজার কাহিনী। শোন তবে। শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমে যাবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীন-কালে বিজয়পুরী নামক নগরে সোমনাথ নামে একজন নৌকা ব্যবসায়ী ছিল। সে বহু বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা করে কোটি

বেতাল কথা

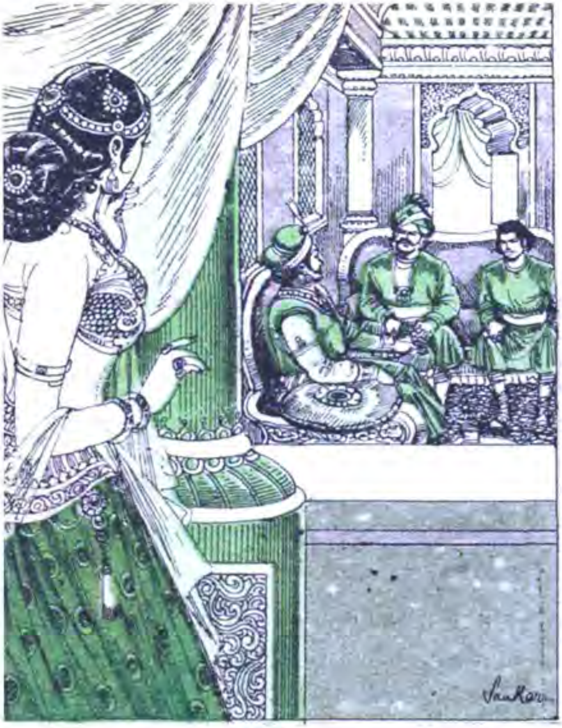

কোটি টাকা করেছিল। তার ছিল নীলদত্ত নামে একটি মাত্র ছেলে। নীলদত্ত যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল তখন তার বাবা নৌকা বোঝাই জাহাজ নিয়ে দূরদেশে যাত্রা করল। পথে প্রচণ্ড ঝড় তুফানের মুখে তার নৌকা পড়ে অতল জলে ডুবে গেল। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস নষ্ট হল এবং সোমনাথের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

দু বছর কেটে গেল। কিন্তু সোমনাথ আর ফেরে নি। ফলে সোমনাথের স্ত্রী স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে গুনতে কঠিন অসুখে পড়ে গেল। তারপর সে আর বেশী দিন বাঁচল না।

সোমনাথকে যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে সাহায্য করত এবং যারা তার কাছ থেকে সাহায্য নিত, তারা নীলদত্তকে ঠকিয়ে বহু টাকা মেরে দিল।

তখন নীলদত্ত যুবক। তাকে সহজেই অন্যান্য নেশায় পেয়ে বসেছিল। টাকা পয়সার হিসাব রাখার ভার সে কর্মচারীদের উপর দিয়ে দিয়েছিল। নীলদত্তের এই খেয়ালী ও অকর্মণ্যতার ফলে তার কর্মচারীরা তাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ফতুর করে দিয়েছিল।

ফলে দেখতে দেখতে নীলদত্তকে সব হারিয়ে পথে দাঁড়াতে হল। কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। সোমনাথের এক বন্ধু নীলদত্তকে থাকার আশ্রয় দিল। সোমনাথের সেই বন্ধুর নাম নবকুবের।

নবকুবেরের সঙ্গে সেই দেশের রাজার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সে যখন তখন রাজার কাছে গিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারত। একবার নবকুবের নীলদত্তকে সঙ্গে করে রাজমহলে গেল। তখন রাজকুমারী লাবণ্যবতী নীলদত্তকে আড়াল থেকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হল। রাজকুমারী মনে মনে ভাবল এহেন রূপবান যুবক যদি তার স্বামী হত তাহলে তার জীবন ধন্য হত।

পরে নীলদত্ত সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে রাজকুমারী তার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারল। নীলদত্ত অন্যের আশ্রয়ে আছে জেনেও তার প্রতি তার আকর্ষণ একরত্তিও কমল না।

কিন্তু নবকুবেরের আশ্রয়ে থাকার ফলে নীলদত্তের নিজের উপর ঘৃণা জাগতে লাগল। সে ভাবল এভাবে যদি সে দিন কাটায় তাহলে তার জীবনে আর কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না। নিজে নিজে যে ব্যবসা করবে তার টাকাও জুটবে না। আবার অন্যের আশ্রয়ে থেকে ব্যবসা করাও অনুচিত। নানা কথা ভেবে একদিন নীলদত্ত নবকুবেরের খাজানা থেকে কিছু টাকা ও কিছু হীরে চুরি করে পালাল। সে ভেবেছিল হীরে বিক্রি করে অন্য কোথাও কিছু একটা করে জীবন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তার সঙ্গে যা ঘটে তার কতটুকুই বা মিল থাকে?

নীলদত্ত যা ভাবল তা হল না। সে নগররক্ষীর হাতে ধরা পড়ল। নগর রক্ষককে সে কিছুতেই নিজের পরিচয় দিল না। এই না জানানোর ফলে নগর-রক্ষী বাকি রাতটা কারাগারে রেখে পরের দিন রাজদরবারে এনে রাজার সামনে তাকে হাজির করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল যে তার নাম নীলদত্ত এবং সে যা নিয়ে পালাচ্ছে তা নবকুবেরের। রাজা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। রাজা তাকে কঠোর শাস্তি দিত। কিন্তু নবকুবেরের অনুরোধে রাজা তাকে শাস্তি দিল না। ছেড়ে দিল। তবে তাকে সেই দেশে থাকার অনুমতি রাজা দিল না।

নবকুবের নীলদত্তের হাতে টাকা ও হীরের থলি দিয়ে বলল, "বাবা, তুমি অন্য কোন দেশে কিছু একটা করে বাঁচার চেষ্টা কর।"

নীলদত্ত চুরি করেছে জেনেও রাজ-কুমারীর মনে ঘৃণা জাগল না। রাজা

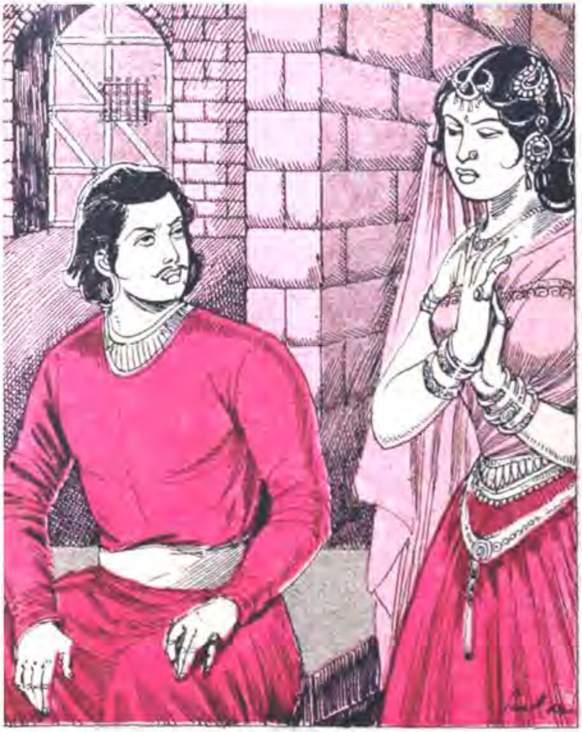

চোর হওয়ার পর তার মনে বিচিত্র এক ইচ্ছা জাগল। দেশে ফেরার ইচ্ছে জাগল তার মনে। একদিন রাত্রে সে পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বিজয়-পুরিতে ঢুকল। সেখানে সে দিনের পর দিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে চুরি করতে লাগল। মন টানে মনের মানুষ। নীল-দত্তের মনে রাজকুমারীকে দেখার ইচ্ছে জাগল। এঘর ওঘর খুঁজে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় সে ধরা পড়ল প্রহরীর হাতে।

পরের দিন যথারীতি নীলদত্তকে হাজির করা হল রাজার কাছে। দেশের বাইরে থাকার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার অপরাধে ও রাজমহলে চুরি করার উদ্দেশ্যে ঢোকার অপরাধে নীলদত্তকে আজীবন কারাভোগের শাস্তি দেওয়া হল। রাজা যদি জানত যে নীলদত্ত অনেকদিন আগেই তার রাজ্যে ঢুকে অনেকের বাড়িতে চুরি করেছে তাহলে তার ফাঁসি দিত।

গোপনে নীলদত্ত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে রাজকুমারী লাবণ্যবতী একদিন গোপন পথে কারাগারে ঢুকে নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল, "নীলদত্ত, আমি যে কোন ভাবে আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারি। মুক্ত হয়ে আপনি কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছেন?"

তাকে দেশ থেকে দূর করে দিচ্ছে জেনে সে খুব দুঃখ পেল।

নীলদত্ত বিজয়পুরী থেকে বেরিয়ে অবন্তীপুরে গেল। কি করবে কি না করবে ভাবতে ভাবতে কিছুদিন কেটে গেল। বসে বসে খরচ করে কাটানোর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তার হাত খালি হয়ে গেল। কাজ না করে বসে কাটানোর ফলে একদিকে যেমন তার টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেল অন্যদিকে তেমনি নানা কু-চিন্তা দানা বাঁধতে লাগল। দেখতে দেখতে সে চুরি করা শুরু করে দিল। অল্প দিনের মধ্যেই হাত পাকিয়ে সে একজন পাকা চোর হয়ে গেল।

“রাজকুমারী, কোথাও গিয়ে আমি কি করব ? আমি তো কোন কাজই পারি না। আমি তো অক্ষম, কাজের অনুপযুক্ত। আমি কারাগারে এখন ভালই আছি।” নীলদত্ত বলল।

রাজকুমারী কারাগারের অধিকারীকে ঘুষ দিয়ে যখন তখন নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করত। তার যখন যা দরকার হত দিত। এইভাবে ওদের দুজনের মধ্যে ঝুঁকি ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে দিনকে দিন ভালবাসা গভীরতর হতে লাগল।

এক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে অবন্তীপুরের রাজা রামসিংহের বড় রাণী মারা গেল। রামসিংহ লাবণ্যবতীর সৌন্দর্যের কথা অনেক আগেই শুনেছিল। সে ঠিক করল লাবণ্যবতীকে বিয়ে করে বড় রাণীর সম্মান তাকে দেবে। তার দূত এসে বিজয়পুরীর রাজাকে বলল, “মহারাজ, অবন্তীপুরের মহারাজ আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চান। আপনি বিয়ে দিতে রাজী না হলে উনি আপনার দেশ আক্রমণ করবেন।”

অবন্তীর রাজা ক্ষমতাবান ছিল। তাকে পরাজিত করার ক্ষমতা বিজয়পুরীর রাজার ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে বিজয়পুরীর রাজা নিজের কন্যা লাবণ্যবতীর সঙ্গে রাজা রামসিংহের বিয়েতে রাজী হলেন।

এই খবর কানে যেতেই লাবণ্যবতীর মনে হল যেন তার মাথায় বাজ পড়েছে। রামসিংহের মত বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে বিয়ে করার চেয়ে তার কাছে মৃত্যু শ্রেয় মনে হল। সেই রাত্রে লাবণ্যবতী গোপনে কারাগারে নীলদত্তের সঙ্গে দেখা করে বলল সব কথা। তারপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বলল, “তাই ভাবছি, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলুন আমরা দুজনে কোথাও পালাই। বলুন, আপনার কোন আপত্তি আছে ?”

নীলদত্ত সেই রাত্রে রাজকুমারী লাবণ্যবতীকে নিয়ে অন্য দেশের দিকে পাড়ি দিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, “মহারাজ, রাজকুমারী লাবণ্যবতী এত ধন-

সম্পত্তি, প্রাচুর্য, সুখ সব ছেড়ে কেন গেল নীলদত্তের সঙ্গে ? সে কি জানত না যে নীলদত্ত বেকার যুবক ? কোন কাজের যোগ্যতা তার মধ্যে যে নেই তা কি সে জানত না ? আর নীলদত্তও এর আগে পালানোর সুযোগ পেয়ে না পালিয়ে পরে পালাতে রাজী হল কেন ? নীলদত্ত কি এক বারও ভেবেছে রাজকুমারীকে কোথায় রাখবে ? কি খাওয়াবে ? না কি ভালবাসা তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ করে ফেলেছিল ? আমার এসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে এই মুহূর্তে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, "নীলদত্ত নিজেকে ঘোষণা করেছিল বটে অকর্মণ্য বলে তাই বলে রাজকুমারী তাকে ভুল বোঝেনি। সে সত্যি যদি অকর্মণ্য হত তাহলে দেশত্যাগের শাস্তি উপেক্ষা করে সে আবার দেশে ফিরে আসত না। দেশে ঢুকলেও রাজমহলে ঢুকত না। আর তার চুরি করার ইচ্ছে থাকলে খাজানা ঘরে গিয়ে ঢুকত। রাজকুমারীর ঘরে ঢুকতে যেত না। রাজকুমারী লাবণ্যবতীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের আশাতেই সে কারাজীবন কাটাতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে রাজ-কুমারী ভাল ভাবেই বুঝেছিল যে বৃদ্ধ রাজার স্ত্রী হওয়ার চেয়ে যুবক নীলদত্তের হাত ধরে পাড়ি দেওয়া অনেক আনন্দের। জীবনের দুঃখ দুর্দশা অনাহার সম্পর্কে রাজকুমারীর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই সে বিষয়ে তার আতঙ্কেরও কোন কারণ ছিল না। বাকি থাকে ভরণ পোষণের প্রশ্ন। নীলদত্ত চুরি করে কোন দিন ধরা পড়েনি। অতএব সে যে কোন দেশে চুরি করতে পারবে।

বিক্রমাদিত্যের এভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে সেই গাছে গিয়ে উঠল। (কল্পিত)

কৃপণ ও গরিব

কোন এক গ্রামে এক ব্যবসাদার ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করলেও খরচ করত না। ভাল খেত না। ছেঁড়া জামা কাপড় পরে কাটাত।

একদিন এক গরিব লোক তার কাছে এল। ঋণ শোধ করে বলল, "আপনি সুদ বাবদ যা পেতেন তাতো দিয়েছি। আমি আপনাকে আরও কিছু টাকা দেব। আপনি দয়া করে আমার একটা উপকার করুন। আপনার ধনভাণ্ডার একবার আমাকে দেখান। আমি তা দেখে চক্ষু সার্থক করতে চাই।"

"চোখের দেখা দেখে কি তোমার পেট ভরবে? তা তোমার যখন ইচ্ছে জেগেছে, তুমি যখন আরও কিছু টাকা দিতে চাইছ, এসো একবার চোখের দেখা দেখে যাও। কি যে তোমার লাভ হবে ভেবে পাচ্ছি না।" কৃপণ বলল।

গরিব লোকটা কিছু টাকা দিয়ে ঐ ধনভাণ্ডার দেখে বলল, "ব্যাস্, এখন থেকে আমিও আপনার মত ধনী হয়ে গেলাম। আমার জীবন সার্থক।"

"এ তুমি কি বলছ?" ব্যবসায়ী বলল।

"ঠিকই বলছি। আপনিও এই ধন দেখে চোখ জুড়িয়ে থাকেন, আমারও চোখ জুড়িয়ে গেল। আপনিও এই ধন খরচ করবেন না, আমিও করব না। খাওয়া পরার ব্যাপারে কোনদিন কিপটেমি করিনি।" বলে লোকটা চলে গেল।

মোমবাতির বিচার

মহারাজা উগ্রগুপ্তের রাজধানী একটি সুন্দর নগরী। গোটা নগরী যেন ছবির মত সাজানো। সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট এবং বিরাট বিরাট পুকুর ও সুন্দর মনোরম উদ্যান। নগরীর মানুষগুলো যেন পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। প্রজারা সুখে ছিল। মহারাজ উগ্রগুপ্ত প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতেন। ফলে তাঁর রাজ্যে আকাল কোনদিন দেখা দিত না। প্রতেবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার ফলে যুদ্ধের আশঙ্কাও ছিল না। দেশে শান্তি থাকার ফলে মানুষের মনেও শান্তি ছিল।

সেদিন ছিল দীপাবলীর দিন। মিলন-গড়ের প্রত্যেকটি বাড়িতে আলোর মেলা। পথঘাট আলোয় আলোয় আলোকিত। নানা রঙের আলো। আলোর বাহারে সমস্ত নগরী যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। রাজ-মহলের আনাচে কানাচে আলোর ফুল যেন ফুটে উঠেছিল।

মোটা মোটা মোমবাতির আলোতে গোটা রাজমহল আকাশের বুকে তারার মত ঢেকে গিয়েছিল। এভাবে সজ্জিত রাজ-মহলের একটি ঘরে বসে রাজা উগ্রগুপ্ত গান শুনছিলেন। উগ্রগুপ্তের গানের প্রতি বিশেষ টান ছিল। মহারাজার শুধু যে গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল তা নয়, জাদু-বিদ্যায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভাবানদের নিয়ে তিনি খুব খুশী ছিলেন। সেই সন্ধ্যায় তাঁর মজলিস জমে উঠেছিল। ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ি সকলের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা বইছিল।

হঠাৎ কার আর্তনাদ শোনা গেল। এক-বার দুবার নয়, বার বার শোনা গেল সেই

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

একই ধরণের আর্তনাদ। রাজকর্মচারীরা ভয় পেল। ভাবতে লাগল, কিসের আর্ত-নাদ! কার কি হয়েছে। উগ্রগুপ্তের একমাত্র ছেলে রাজমহলের নারায়ণের ঘরে বসে কাঁদছিল। তার কান্নাই রাজমহলের দেয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজকুমার ভীষণ ভয় পেয়ে ডান হাতটাকে বাঁ হাত দিয়ে ধরে কাঁদছিল। রাজকুমারের বয়স ছিল সাত বছর। তাকে রাজপ্রাসাদের সবাই স্নেহ করত। রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে?" পরক্ষণেই দেখেন রাণীর কোলে তাঁর ছেলে।

"কি সর্বনাশ হয়েছে দেখুন। কুমারের আঙ্গুল আগুনে পুড়ে গেছে।" রাণী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন।

রাজা ঘুরে ধাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ওকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে-ছিলে? এত আলো জ্বলছে এর মধ্যে ওকে একা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে?"

"মহারাজ, আমি কুমারের কাছেই ছিলাম। কুমার খেলতে খেলতে হঠাৎ মোমবাতির আলোতে যে তার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। হঠাৎ এভাবে কুমার নিজের আঙ্গুল আগুনে পোড়াবে আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। মহারাজ, আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা করবেন।" ধাই বলল।

ততক্ষণে রাজবৈদ্য এসে রাজকুমারের আঙ্গুলে ওষুধ লাগাল। রাণী কুমারকে কোলে নিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে নগরীর বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে লাগলেন। কিন্তু কুমারের অবস্থা ঘরপোড়া গরুর মত। তার খালি মনে হচ্ছিল সব আলো এগিয়ে এসে তাকে পুড়িয়ে ফেলবে।

"আগে তুমি এখান থেকে এইসব আলো সরাও তারপর আমি জানলায় দাঁড়াব।" রাজকুমার কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলল।

"তোমার আঙ্গুলে আর আগুন লাগবেনা বাবা! আগুন তো তোমার কাছে আসবে না তুমি যদি এখন আগুনে হাত ঢোকাও,

রাজকুমার চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। হাতের কাছে যা পেল তাই ভীষণভাবে রেগে গিয়ে ছুঁড়তে লাগল।

তখন প্রধান মন্ত্রী মহারাজ উগ্রগুপ্তের কাছে এসে বলল, "মহারাজ, হঠাৎ এই কাণ্ড ঘটায় রাজকুমারের মনের গভীরে ভয় ঢুকে গেছে। তার স্নায়ুতে ভীষণ চাপ পড়েছে। রাজকুমারের অবস্থা হয়েছে ঘর পোড়া গরুর অবস্থা। যে কোন মোমবাতিই তার কাছে এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজকুমারের কচি মন থেকে যদি এই ভয়ের কারণ দূর করা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এর পরিণাম খুব খারাপ হবে। যে কোন ভাবে মোমবাতির ব্যাপারে তার ভীতি দূর করতেই হবে। একটা না একটা উপায় বার করতেই হবে।"

মহারাজ উগ্রগুপ্ত অনেক ভাবলেন। কিন্তু ভেবেও তিনি কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারলেন না।

"মহারাজ, আপনিতো জাদুবিদ্যা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখেন, সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে কুমারের মন পরিবর্তনের চেষ্টা কর–ছেন না কেন?" রামমোহন নামে দরবারের একজন বলল।

"রামমোহন, তুমি একটা ভাল পরামর্শ দিয়েছ। চেষ্টা করে দেখা যাক জাদুবিদ্যার প্রয়োগে কতদূর কি করা যায়। হয়তো

আঙ্গুল তো পুড়বেই।" রাণী বুঝিয়ে বুঝিয়ে কুমারকে বললেন।

"না, ওসব আমি শুনতে চাই না। আগে এই মোমবাতিগুলো সরাও। রাজপ্রাসাদে একটাও মোমবাতি জ্বলবে না। এক্ষুনি সব মোমবাতি ফেলে দাও। একটাও রাখা চলবে না।" রাজকুমার কাঁদতে কাঁদতে অভিমানের সুরে বলল।

"বাবা মোমবাতি না জ্বললে আলো হবে না। আলো না হলে অন্ধকার দূর করা যাবে না। তখন অন্ধকারেই আমাদের বসে থাকতে হবে।" বললেন রাজা।

"না ওসব আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। সব মোমবাতি সরিয়ে দাও।" বলতে বলতে

কুমারের মন পরিবর্তন হতে পারে।” মহারাজ উগ্রগুপ্ত বললেন।

কিছুক্ষণ ভেবে মহারাজ উগ্রগুপ্ত কুমারের কাছে গিয়ে বললেন, “বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। রাজপ্রাসাদ থেকে সমস্ত মোমবাতি তুলে ফেলে দেব। শুধু রাজপ্রাসাদ কেন সমস্ত দেশ থেকেই মোমবাতি দূর করে দেব। যে মোমবাতি আমার ছেলের আঙ্গুল পুড়িয়ে দেয়, আমার দেশে তার কোন স্থান নেই। তাকে আমি কোন ক্রমেই ক্ষমা করতে পারি না। কি বলেন প্রধান মন্ত্রী?” বলে রাজা প্রধান মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন।

“মহারাজ আপনার কথাই ঠিক। আমরা দেশে আর একটিও মোমবাতি রাখবো না।” মন্ত্রী রাজার ইশারা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন।

রাজা ও মন্ত্রীর এই কথা শুনে রাজকুমারের কষ্ট যেন অনেকখানি কমে গেল। মনে মনে সে খুব খুশী এল এই ভেবে যে মোমবাতির উচিত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তারপর কুমারকে কোলে বসিয়ে রাজা বললেন, “দেখ বাবা, আমি রাজা। আমার কর্তব্য হল শাস্তি দেওয়ার আগে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা। না শুনে বিচার করা যায় না। বিচার না করে শাস্তি দেওয়া অপরাধ। বিচার করে দেখতে হবে, তার মধ্যে কোন ভাল গুণ যদি থাকে তাহলে তাকে সেই গুণের জন্য ক্ষমাও করা যেতে পারে। তা না হলে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হবে। তুমি কি বল বাবা!”

রাজকুমার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইল।

উগ্রগুপ্ত ভাঁড়ার থেকে একটি মোমবাতি আনালেন। মোমবাতির দু-দিকের পলতে বের করালেন। মোমবাতির মাঝখান দিয়ে একটি ছুঁচ ঢুকিয়ে সেই ছুঁচ দুটি গ্লাসের মাঝখানে, সেই ছুঁচের সাহায্যে মোমবাতিটিকে রাখতে বললেন। দুটি শিশুর পুতুল বানিয়ে ঐ গ্লাসের দুদিকে বসিয়ে দিলেন। রঙিন পুতুল দুটো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তারপর মোমবাতির দু-মুখে আগুন জ্বালালেন। গ্লাসের জল, মোমবাতির মিঠে আলো, রঙিন পুতুল, জ্বলন্ত মোমবাতি থেকে গলে ঝরতে থাকা মোম সব মিলিয়ে এক মনোরম অলৌকিক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করছিল।

রাজা বললেন, "বাবা ভাল করে দেখ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

জ্বলন্ত মোমবাতি নড়ছিল। তার নড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুতুলগুলোও যাতে নড়ে তার ব্যবস্থা করা ছিল। সব মিলিয়ে যে অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা দেখে অবাক হয়ে রাজকুমার আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "কি সুন্দর, কি অদ্ভুত!"

"আর দেরি নয় বাবা, এক্ষুণি দেশ থেকে সমস্ত মোমবাতিগুলোকে দূর করে দিতে হবে।" রাজা কুমারকে বললেন।

"বাবা, মোমবাতির তো কোন দোষ ছিল না। আমিই জ্বলন্ত মোমবাতির আগুনে হাত ঢুকিয়েছি। দোষ আমার, মোমবাতির নয়। প্রত্যেক জিনিসের দোষ এবং গুণ দুটোই থাকে। তুমি ঠিকই বলেছ বাবা! মোমবাতির কোন দোষ নেই, দোষ আমারই। তুমি ওদের শাস্তি দিও না। এবার থেকে আমি আগুনে হাত দেব না। সাবধান হব।" রাজকুমার বলল।

তখন রাজা বিচারের রায় ঘোষণা করার মত গলা করে বললেন, "এতদ্বারা আমি ঘোষণা করিতেছি যে, নিরপেক্ষ বিচার করিয়া মোমবাতি যে নির্দোষ তাহার প্রমাণ পাইলাম। এখন হইতে মোমবাতিগুলো সর্বত্রই জ্বলিবে এবং অন্ধকার দূর করিতে থাকিবে।"

মহারাজ উগ্রগুপ্তের রায় শুনে অন্যান্যদের সঙ্গে রাজকুমারও হাততালি দিয়ে উঠল। এইভাবে রাজকুমারের কচি মন থেকে আলোর প্রতি ঘৃণা দূর করা গেল এবং আগুনের ব্যাপারে কুমার সাবধান হল।

ক্ষুধার ওষুধ

কোন এক দেশে একবার আকাল দেখা দিয়েছিল। সেই দেশের রাজা মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের ডেকে বলল, "আমাদের দেশে এখন আকালের করাল ছায়ায় নেবে গেছে। খেতে না পেয়ে মানুষ পথে ঘাটে মারা যাচ্ছে। এখন আমি ভাবছি এমন এক ক্ষুধা নিবারণের ওষুধ বানানো দরকার যাতে কোন দিন কারো খিদে না পায়।"

রাজার কথা শুনে রাজার পরামর্শদাতা, মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীরা কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন্ কথা বললে যে রাজা রেগে যাবেন আর কোন্ পরামর্শ দিলে যে রাজা খুশী হবেন তা ভেবে পেলো না।

অনেকক্ষণ পরে আর নীরব থাকতে না পেরে সুবুদ্ধি নামে এক মন্ত্রী বলল, "মহারাজ আমাদের দেশে আকাল কোন নতুন জিনিস নয়। প্রত্যেক বছর দেশের কোন না কোন অঞ্চলে আকাল হয়ে থাকে। আকাল দূর করতে হলে দেশে জল সেচের ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। জল না হলে মাটি তৈরি হয় না। মাটি তৈরি না হলে চাষ ভাল হবে না। চাষ না হলে আকাল হবেই। ওষুধে আকাল যাবে না।"

"জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করানোই রাজার কাজ। আমি ক্ষুধা দূর করার ওষুধ তৈরি করাবোই।"

রাজা সারা দেশের বৈদ্যদের ডেকে বললেন, "তোমাদের এক মাস সময় দিচ্ছি। এই এক মাসের মধ্যে যে কোন ভাবে ক্ষুধা মেটানোর ওষুধ বানাতেই হবে।"

বৈদ্যরা রাজার কথা শুনে এমনভাবে যে যেখানে ছিল সেখানে রইল যেন

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

তাদের মাথায় বাজ পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে একজন বৈদ্য বলল, "মহারাজ, সত্যের খাতিরে আমাকে একটি কথা বলতে হচ্ছে। এমন কোন বৈদ্যগ্রন্থ নেই যাতে ক্ষুধার জ্বালা মেটানোর ওষুধ বের করা যায়।"

"এটা যদি এখানকার সমস্ত বৈদ্যের মত হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেককেই কারাগারে যেতে হবে। এই, কে আছিস, এদের সবাইকে কারাগারে পুরে ফেল।" রাজা বলল।

ঠিক তখন এক বুড়ো বৈদ্য দুহাত তুলে এসে বলল, "মহারাজ, কাউকে কারাগারে পুরতে হবে না। আমি ভার নিচ্ছি। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি যে ওষুধ চাইছেন সে ওষুধ তৈরি করে দেব।"

"এই হল সত্যিকারের বৈদ্য।" বলে রাজা অনেক প্রশংসার কথা বলল। কাউকে কারাগারে পুরল না।

কিছুদিন পরে সেই বুড়ো রাজার কাছে এসে তালের মত একটা গোলাকার পদার্থ রাজার হাতে দিয়ে বলল, "মহারাজ, এর থেকে ছোট্ট কণা মুখে দিলেই জীবনে আর খিদে পাবে না।"

রাজা ঐ বুড়োকে অনেক উপহার দিয়ে বিদায় করল। আর ঐ ওষুধটাকে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিল। মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা ঐ ওষুধ খেল না। ফলে তাদের আগের মতই খিদে পেত।

খবর নিয়ে রাজা জানতে পারল যে প্রজাদের খিদে পাচ্ছে না।

একদিন মন্ত্রী এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ, লোকে কাজ কর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। যেহেতু খিদে নেই সেহেতু ওরা ঘুমিয়ে আনন্দ করে কাটাচ্ছে।"

দুদিন পরে আবার মন্ত্রী এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ, প্রজারা অন্যকাজ বন্ধ করে দিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রজারা কাপড় বোনা যে বন্ধ করে দিয়েছে। ওদের দেখাদেখি নাপিত চুল কাটছে না দাড়ি কামাচ্ছে না। ফলে প্রতি দিন যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার অনেক অভাব দেখা দিয়েছে। আগে খাদ্য পাওয়া যেত না। এখন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।"

কয়েকদিন পরে মন্ত্রী আবার এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ, প্রজারা কেউ কাউকে মানছে না। যা ইচ্ছে করছে। সারা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা রেগে গিয়ে বলল, "প্রজারা এত তাড়াতাড়ি নিমকহারাম হয়ে গেল? ওদের আমি এত কষ্ট করে খিদের ওষুধ পাইয়ে দিলাম আর ওরা আমার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চাইছে? যাও সেনাপতিকে বল যে সেনাবাহিনীতে যেন আরও বহু লোককে নেয়।"

"মহারাজ, আমাদের সেনাবাহিনীতে তো সেনারা আর নেই?" মন্ত্রী বলল।

হঠাৎ সেনাপতি হাজির হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাজাকে বলে, "মহারাজ, আমাদের শত্রু চণ্ডপ্রচণ্ড অসংখ্য সেনা নিয়ে আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে আর আমাদের

রাজধানী ঘিরে ফেলেছে। কি হবে মহারাজ, আমার বাহিনীতে যে আর একটিও সেনা নেই। বলুন মহারাজ, কি করবো?"

"কি আর করবো? আত্মসমর্পণ ছাড়া তো আর পথ দেখছি না।" রাজা বলল।

সেনাপতি কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় চারদিক থেকে ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। বহু সেনা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ল। ঐসব শত্রু সেনারা রাজাকে ঘিরে ফেলে বলল, "এই যে রাজা আমাদের হাত থেকে পালানোর কোন রকম চেষ্টা করবেন না। চেষ্টা করলেই বধ করবো।"

"যত নষ্টের গোড়া আমার ঐ ক্ষুধার ওষুধ। না হলে কি পারতো শত্রুরা আমাকে বন্দী করতে? রাজা বলল।

সেই বুড়ো বৈদ্য এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ, আমি আগেই বলেছিলাম, খিদে মেটানোর ওষুধ অনেক বিপদ ডেকে আনবে। যাক এখন যে আপনি বুঝেছেন তাতে আমি খুশী হয়েছি।" বলে বৈদ্যের পোষাক খুলে ফেলল ঐ বুড়ো। রাজা দেখতে পেল বুড়োটা স্বয়ং সুবুদ্ধি।

"মহারাজ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যখন আমার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনলেন না তখন আমি ঠিক করলাম ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনাকে বোঝানোর। ক্ষুধার ওষুধ নামে কোন ওষুধ আজও পাওয়া যায়নি মহারাজ। আপনার অজান্তে দেশে সেচের উন্নতি ঘটানো হয়েছে। ফসলের ক্ষেতে যাতে জল যায় তার সুব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে ফসলের উৎ-পাদন বেড়েছে। আকাল দূর হয়েছে। যারা আপনাকে এখন ঘিরে রয়েছে এরা কেউ শত্রু পক্ষের নয়। এরা সব আমাদের সেনাবাহিনীর লোক। আমি যা করেছি একটা চিরন্তন সত্য আপনাকে বোঝানোর জন্য করেছি। এর জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।" মন্ত্রী সুবুদ্ধি বলল।

তিন কড়ির পুণ্য

এক গ্রামে প্রভুদয়াল নামে এক ব্যবসায়ী ছিল। প্রচুর টাকা রোজগার করত কিন্তু খরচ করতে চাইত না। কর্তার এই কিপটেমি বউ মীনাক্ষীর ভাল লাগত না। পুণ্য কাজের নাম করে তার হাত থেকে কিছু গলানো যেত।

প্রভুদয়ালের কাছে টাকা পয়সার তো অভাব ছিল না কিন্তু একটি অভাব ছিল। এবং সেই অভাব হল ছেলে-মেয়ের। অনেক দেব দেবীর পূজা করে, মানত করেও যদি একটি বাচ্চা হয় হোক। এই ছিল মীনাক্ষীর অনেক দিনের বাসনা। কিন্তু অনেক মানত করেও যখন কিছুতে কিছু হল না তখন সে তার শরীরের সমস্ত গয়নাগাটি মানত রাখল। একটি বাচ্চা হলেই সে সমস্ত গয়না ঠাকুরের নামে দিয়ে দেবে।

কয়েক মাস পরে মীনাক্ষীর একটি বাচ্চা হল। তারপর সে তার মানতের কথা তার স্বামীকে জানাল। সে কথা শুনে প্রভুদয়াল আঁৎকে উঠে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার শরীরের সমস্ত গয়নার দাম কত জান? এক পয়সা রোজগার করে বাড়ানোর কথা ভাব না, খালি খরচ করার তাল।"

মীনাক্ষী রাগে অভিমানে বলল, "মানতের ব্যাপারে তুমি বারণ করতে পার না। সন্তানের অমঙ্গল হয়। মানত ঠাকুরের কাছে। তোমার কথা শুনে ঠাকুর রাগ করবেন।"

কিছুক্ষণ ভেবে প্রভুদয়াল ভয়ে ভয়ে বলল, "ঠিক আছে ঠাকুরকে চটাতে চাই না। এবারে যা করেছ করেছ; ভবিষ্যতে আমাকে না জিজ্ঞেস করে মানত টানত করবে না।"

অনুরাধা দেবী

"ঠিক আছে তাই হবে। এবারকার মত তুমি বাধা দিও না।" মীনাক্ষী বলল।

মীনাক্ষী ভাবল পরের কথা পরে। ভবিষ্যতে বাচ্চার অসুখ করতে পারে, তার অসুখ করতে পারে, তার স্বামীর অসুখ করতে পারে, কোন বিপদ আপদ ঘটলেও তো তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য লোকে মানত রাখে। আর মানত রাখলেই যে সব কিছু হয়ে যায় তার কি মানে আছে। এখনকার মত—স্বামী যা বলছে তাতেই রাজী হয়ে ভালই করেছি। লোকটা সারা জীবন পয়সার [illegible]। খরচের কথা বললেই [illegible] হয়ে যায়। যদি [illegible] তার নয়? বাচ্চা বড় হলে নাম বাপেরই হয় আমাকে আর কজন চিনবে।

কয়েকদিন পরে মীনাক্ষী সমস্ত গয়নাগুলো পরল এবং স্বামী-স্ত্রীতে মন্দিরে গেল। যাওয়ার সময় সারা পথে প্রভুদয়াল মীনাক্ষীর একটি একটি গয়না ধরে টাকার হিসেব করতে লাগল।

"দেখ ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে তুমি অত টাকা পয়সার হিসেব করো না তো খুব খারাপ অভ্যেস তোমার।" মীনাক্ষী বলল।

কিছুদূর যেতেই এক সাধুর সঙ্গে দেখা। প্রভুদয়াল তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হলে সেই সাধু বলল, "বাবু, দান ধর্ম করলে পুণ্য অর্জন হয়। আজ দুদিন আমি কিছু খাইনি, কিছু দান করে যান।"

"ওরে ব্যাটা, তোর কাছে আমার আর উপদেশ শুনতে হবে না। আমি দুপয়সার পুণ্য চাই না। আমি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে পুণ্য অর্জন করতে যাচ্ছি।" প্রভুদয়াল বলল।

একথা বলে স্বামী এগিয়ে গেলে মীনাক্ষী ঐ সাধুকে তিনটে কড়ি দান করে। ব্যাপারটা প্রভুদয়ালের নজরে পড়ে গেল। সে বলল, "আরে, তুমি তো আচ্ছা মেয়েছেলে? সারা পথে এভাবে দান করলে আমাদের তো ফেরার পয়সা থাকবে না।"

বেচারা দুদিন খায়নি তাই দিলাম।" মীনাক্ষী বলল।

পুণ্যতীর্থ ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে চান করে প্রভুদয়াল বলল, "দেখ মীনাক্ষী আমি পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেছি। গায়ের গয়নার পরিবর্তে টাকা ধরে দিলেও হবে। পথে বিপদ আপদ হতে পারে ভেবে আমি অনেক টাকা এনেছি। পুরুতের হাতে এখন অর্দ্ধেক টাকা দেব বাকি টাকা আমা-দের ফেরার সময় দেব।"

"তা মন্দ কি।" মীনাক্ষী স্বামীর কথা বিশ্বাস করে বলল।

তারপর মীনাক্ষী নিজের গায়ের সমস্ত গয়না স্বামীর হাতে দিল। স্বামী কিছু টাকা ঠাকুরের নামে জমা করার জন্য দিল।

মীনাক্ষী আড়ালে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল স্বামী মন্দিরের অধিকারী ও পুরুতের সঙ্গে কি যেন ফিসফাস করছে। পাছে জিজ্ঞাসা করলে রেগে যায় এই ভয়ে মীনাক্ষী তাকে কোন প্রশ্ন করল না। প্রভুদয়াল ভাবল, সে যা করছে মীনাক্ষী তা টের পায়নি।

এদিকে বাকি যে টাকা ফেরার পথে দিয়ে যাবার কথা ছিল সেই টাকা মীনাক্ষী হাতে নিয়ে রেখেছিল। মন্দিরের অধিকারী, পুরুত ঠাকুর ও প্রভুদয়াল যখন গোপনে কথা বলাবলি করছিল তখন মীনাক্ষীর মন বলছিল তার স্বামী যেভাবে কথায় কথায় দিব্যি কাড়ে তাতে সে যে দেবতাদের প্রতি অবিশ্বাসী তা বোঝা যায়। ঠাকুর দেবতার নামে মিথ্যে কথা বললে যে ক্ষতি হয় তা সে মনে করে না। এহেন লোক যখন পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে তখন বুঝতে হবে যে দেবতাকে ঠকানোর জন্য সে পুরুতের সঙ্গে পরামর্শ করছে। মীনাক্ষী ঠাকুরের নামে রক্ষিত সিন্দুকে টাকাগুলো ঢেলে দিল।

ফলে ওরা দুজনে যখন বাচ্চা কোলে নিয়ে বেরুল তখন তাদের কাছে একটি পয়সাও ছিল না। ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হল। বাকি টাকা

মীনাক্ষী যে সিন্দুকে ঢেলে দিয়েছিল তার ফলে এই ঝগড়া।

ফেরার পথে সেই সাধুর সঙ্গে আবার দেখা। সাধুকে দেখেই প্রভুদয়াল ভীষণ রেগে গেল। সাধু ওদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে চলে গেল। গ্রামে পা দিতেই প্রভুদয়ালের কানে একজন মহিলার কথা গেল, "একটা হাড় কেপ্পন লোকের জন্য অত পাহারা দেবার কি দরকার ছিল।"

হাড় কেপ্পন লোক বলতেই কথাটা প্রভুদয়ালের কানের ভিতর দিয়ে যেন মনে গেঁথে গেল। যার যেখানে ব্যথা। প্রভুদয়াল জানে সে কত লোককে ঠকিয়েছে। সে জানে গাঁয়ের কেউ তাকে ভালবাসে না। সে আরও জানে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো প্রত্যেকেই তাকে হাড় কেপ্পন বলে জানে। তাই ঐ শব্দ তাকে শুনিয়ে যখন কেউ বলে তখন সে একটু চমকে উঠে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঐ মহিলাকে প্রশ্ন করল।

"কি আর বলব। যেদিন থেকে আপনারা তীর্থে বেরুলেন সেদিন থেকেই ঐ সাধু আপনাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল। ওর পাহারা দেবার ফলেই তো আপনার বাড়িতে চোর ঢুকতে পারল না। চোর আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধু চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করে সাধু এমন কাণ্ড করল যে লোক জড় হয়ে গেল।" মহিলা বলল।

"তিন কড়ির পুণ্যই শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করল।" মীনাক্ষী বলল।

মানুষ কোন কিছুই নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে, পরিবেশের প্রভাবে প্রভুদয়াল একদিন লোভী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। পরে সাধুর ত্যাগ ও মহৎ কাজ দেখে তার চরিত্রের মোড় ঘুরে গেল।

প্রভুদয়াল তখন অনুতপ্ত হল সাধুর প্রতি তার খারাপ ব্যবহারের জন্য। তার পর থেকে প্রভুদয়াল উদার হল এবং দান ধর্ম করতে লাগল।

বৈতরণী

এক গরিব কিষাণের কাছে একটি ভাল দুধালো গরু ছিল। ঐ গাঁয়ে ছিল এক লোভী পুরুত ঠাকুর। ঐ দুধালো গরুটির উপর তার নজর পড়েছিল।

ঐ কিষাণের বাবা মারা যাওয়ার পর শ্রাদ্ধ শান্তি সেরে পুরুত কিষাণকে বলল, "শোন হে, তোমার বাবা স্বর্গে যেতে যেতে হঠাৎ আটকে পড়েছেন। ওঁর পথে বৈতরণী পড়ে গেছে। ওটা পার হতে না পারলে তো স্বর্গে যেতে পারবেন না! বৈতরণী পার হতে হলে ভাল গরু ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে। ঐ গরুর লেজ ধরে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারবেন।"

কিষাণ ঐ পুরুতকে দুধালো গাইটি দান করলো। কিন্তু তার মনে খুব দুঃখ হল ঐ দুধালো গাই দান করে।

কয়েকদিন পরে পুরুতের বাড়ি গিয়ে কিষাণ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "পুরুত ঠাকুর আমার বাবা কি বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে গেছেন?"

"কবে চলে গেছেন।" পুরুত বলল। "আবার যদি ফিরে আসেন?" কিষাণ বলল। "একবার যে বৈতরণী পার হয় আর তার ফেরার উপায় থাকে না।" পুরুত বলল। "তাহলে আমি আমার গরু নিয়ে যাচ্ছি।" বলে কিষাণ গরু নিয়ে বাড়ি গেল।

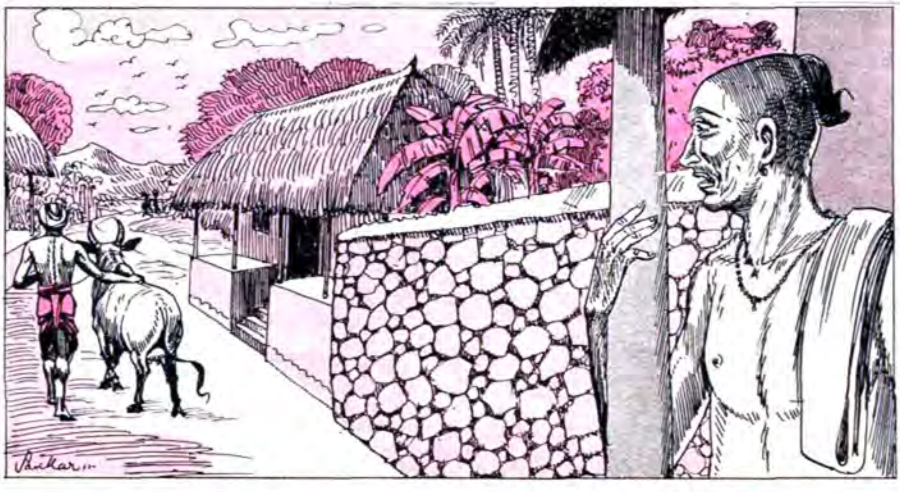

যোগ্যতার প্রমাণ

রামের একমাত্র ছেলের নাম সোমেন। রামের সব সময় মনে হত তার ছেলের কোন যোগ্যতা নেই। সে কোন দিন মানুষ হতে পারবে না। তার বুদ্ধি হবে না কোন দিন। রাম সব সময় ছেলেকে এটা করতে ওটা করতে বারণ করত। চোখে চোখে রাখত। সব সময় পিছনে লেগে থাকার ফলে ছেলের যে খারাপ হচ্ছে সে কথা রাম ভুলেও কোনদিন চিন্তা করত না।

এত কড়াকড়ির মধ্যেও সে একটি অভ্যেস করে ফেলেছিল। পুকুরে চান করতে নেবে সে ডুবে থাকত অনেকক্ষণ। এই অনেকক্ষণ ডুবে থাকা ছাড়া অন্য কোন গুণ তার ছিল না। এভাবে থাকার ফলে সোমেনের মাথা যেন একটু একটু খারাপ হতে লাগল।

ছেলের মাথা খারাপের লক্ষন দেখে বাপ ভাবল বিয়ে দিলে তার মাথা ঠিক হয়ে যাবে। রাম পাত্রীর খোঁজ করতে শুরু করল। কিন্তু গ্রামের লোক কেউ মেয়ে দিতে রাজী হল না।

একদিন পাশের গ্রাম থেকে মেয়ে দেখানোর একটা প্রস্তাব এল। রাম সোমেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে ছেলেকে বোঝাতে লাগল, "দেখ বাবা, ওদের বাড়িতে গিয়ে জুতো খুলে এক কোণে রেখে ঘরের ভিতরে ঢুকবি। পারলে দরজার আড়ালে জুতো রাখবি। যেখানে সেখানে বসবি না। চেয়ারে বসবি।"

রাম সারা পথ বাপের কথা মনে রাখার চেষ্টা করেছিল। সে যত বেশি করে মনে রাখার চেষ্টা করতে লাগল তত বেশি তার মাথা তালগোল পাকাচ্ছিল।

অজিত সরকার

মেয়ের বাড়িতে গিয়ে সোমেন জুতো জোড়া চেয়ারে রেখে নিজে দরজার আড়ালে বসে পড়ল। মেয়ের বাবা প্রথম দর্শনেই সোমেনের যে মাথা খারাপ তা বুঝে নিল। মেয়ের বাবা কোন ভূমিকা না করে সোজা রামকে বলল, "মশাই, আমার মেয়ে কি জলে পড়ে গেছে যে এই পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব? এ ছেলেকে বিয়ে দেবার কথা আপনি ভাবছেন কি করে?"

বাড়ি ফিরেই রাম সোমেনকে রেগে গিয়ে বলল, "কোন মানুষ নিজের মেয়েকে তোর সঙ্গে বিয়ে দেবে না। যা, যদি কোন অমানুষ কোন দিন তোকে যদি মেয়ে দেয় তাহলে তোর বিয়ে হবে।"

সোমেনের মনে জিদ চাপল। এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হবে যে মানুয় নয়। সেই দিন রাত্রে সোমেন বেরিয়ে পড়ল। তিন দিন পথ চলার পর চতুর্থদিন সন্ধ্যায় সে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকতে গেল। গুহার ভিতর থেকে সে বিচিত্র ধ্বনি শুনতে পেল। গুহার ভিতর রাক্ষস ঘুমাচ্ছিল। তার নাক ডাকার বিচিত্র ধ্বনিই সোমেনের কানে গেল।

এক-পা এক-পা করে গুহার ভিতরে ঢুকে এগিয়ে সোমেন রাক্ষসকে দেখতে পেল। দু-চোখ ভরে ঘুমন্ত রাক্ষসকে দেখল। মানুষের সঙ্গে তার যত মিল তত

গরমিলও তার নজরে পড়ল। দেখতে দেখতে সে ভাবল, "এই জীবটিকে ঠিক মানুষের মত দেখাচ্ছে না। হয়ত একেই অমানুষ বলে। এর মেয়ের সঙ্গেই বোধ হয় আমার বিয়ে হবে। মেয়েকে দেবার ভয়ে ব্যাটা আমি আসব জানতে পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে।" ভাবতে ভাবতে সোমেন রাক্ষসের ঝুঁটি ধরে টান মারল।

রাক্ষস বিরাট হাই তুলে গর্জে উঠে বলল,, "আরে আমাকে কে তুলেছে!"

"এবার কোথায় যাবে? আর দেরি নয়, এক্ষুনি যা দেবার দিয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।" সোমেন

কথাগুলো বলতে বলতে রাক্ষসের কান ধরে টানতে লাগল।

রাক্ষসের ভীষণ রাগ হল। সে সোমেন-কে তুলে আছাড় মেরে খেয়ে ফেলবে ঠিক করতেই রাক্ষসী তার কাছে পৌঁছে গেল। সোমেনের কথা রাক্ষসী শুনছিল। রাক্ষসী কদিন ধরে পাত্র খুঁজছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসতে চাইছিল না।

রাক্ষসী রেগে গিয়ে রাক্ষসকে বলল, "ভাবী জামাইকে কোথায় আদর যত্ন করবে তা নয় উল্টে রাগ করছ।"

"ভাল কথা, আমি এতক্ষণ জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। কোই মেয়ে কোথায়?" বলে সোমেন চারদিক তাকাতে লাগল।

"এখন সে বেড়াতে বেরিয়েছে। এক প্রহর পরে ফিরবে। তুমি বাবা অনেক দূর থেকে এসেছ। একটু ঘুমিয়ে নাও। তার আগে একটু খেয়ে নাও।" রাক্ষসী বলল।

রাক্ষসী কিছুক্ষণের মধ্যেই ফল ও দুধ এনে দিল। সোমেন পেট ভরে খেয়ে আরও ভিতরের গুহায় ঢুকে জন্তুজানোয়ারের চামড়ার উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমেনের স্বাস্থ্য দেখে তাকে খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে জাগল রাক্ষসের। তার সে ইচ্ছে টের পেয়ে রাক্ষসী গুহার মুখে বসে পাহারা দিতে লাগল। মাঝ রাত নাগাদ রাক্ষসী দেখতে পেল মেয়ে আসছে।

এদিকে মা ও মেয়ের গলার আওয়াজে সোমেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে জেগে

ঘুমোনোর ভান করে মা-মেয়ের কথা শুনতে লাগল। "কোথায় গিয়েছিলি? তোর মরদ অনেকক্ষণ এসে তোর খোঁজ করছে।" রাক্ষসী মেয়েকে বলল।

"কোথায় সে দেখি, দেখিতো কেমন মরদ।" মেয়ে বলল। তখন রাক্ষসী মেয়েকে গুহার ভেতরে চামড়ার উপর ঘুমন্ত সোমেনকে দেখাল। সোমেন অল্প চোখ খুলে মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মেয়ের চেয়ে ওর বাবা মা যেন কিছুটা সুন্দর। মেয়ের রূপ ভয়ঙ্কর।

সোমেনকে দেখে রাক্ষসীর মেয়ে বলল, "ওমা এ যে একেবারে মাখন গো!"

"সে কিরে? অমন কথা বলছিস কেন? তুই একে খাওয়ার কথা ভাবছিস নাকি? দেখিস মা অমন কাজ করিস নি! একে হারালে তুই আর অন্য বর পাবি না।" রাক্ষসী সাবধান করে দিল মেয়েকে।

"আমি ছাড়লে কি হবে মা, বাবা কি আর এমন সুন্দর মানুষের দেহ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে? বাবাকে কিছুতেই বাধা দেওয়া যাবে না। বাবা খাবেই।" মেয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করল।

"সেইজন্যই তো আমি এতক্ষণ এইখানে পাহারা দিচ্ছিলাম। আমি এইবার একটু ঘুরে আসি তুই পাহারা দে।" এই কথা বলে রাক্ষসী সেখান থেকে চলে গেল।

সোমেনের দিকে রাক্ষসী যত তাকায় তত তার মনে তাকে খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল-তর হতে থাকে। মেয়ে জানে যে তাকে

খেয়ে ফেললে তার মা তাকে আস্ত রাখবে না। নিরুপায় হয়ে মেয়ে সোমেনকে ডেকে তুলে বলল, "চল বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

এতক্ষণ সোমেন মা-মেয়ের কথা শুনেছিল। তাই সে অনুমান করতে পারল যে মেয়ে তার ক্ষতি করার তালে আছে। তাই সে মেয়েকে বলল, "বিয়েতে যে সব জিনিস পত্তর দেওয়া হবে সেগুলো আগে এখানে নিয়ে এস, তার পরের কথা পরে।"

রাক্ষসীর মেয়ে অন্য এক গুহার ভেতর ঢুকে গেল। মণি মুক্তো হীরা চুনি পান্না ভর্তি একটি থলি এনে সোমেনের হাতে দিয়ে বলল, "হল তো ? এবার চল।"

সোমেন থলির মুখ ভাল করে বেঁধে বগল দাবা করে তার সঙ্গে গেল।

গুহার বাইরে রাক্ষসীর মেয়েকে সোমেন বলল, "দেখ বিয়ে করার আগে চান করতে হয়। চান করে নি।"

রাক্ষসীর মেয়ে সোমেনকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল। সোমেন ঐ মুক্তোর থলি নিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে জলেই বসে রইল।

পুকুর ঘাটে রাক্ষসীর মেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল কিন্তু সোমেন উঠল না। সে জলকে ভীষণ ভয় করতো তাই সে সাহস করে জলে নেবে সোমেনকে খোঁজেনি। সে ভাবল, ও নিশ্চয়ই মরে গেছে। সকালে তীরে এলে তখন তাকে খাওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ পরে সোমেন মাথা তুলে দেখে আশেপাশে কেউ নেই। সে আর দেরি না করে সোজা বাড়ি মুখো ছুট দিল।

এত মণি মুক্তো নিয়ে বাড়ি ফেরার ফলে দু-একদিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি পাত্রী জুটে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রচার হয়ে গেল যে রামের ছেলে সোমেন যে কোন লোকের চেয়ে বেশি যোগ্য। যোগ্যতার এত বড় প্রমাণ আশপাশের কোন গ্রামের কেউ তার আগে কোনদিন দিতে পারেনি।

চুরির ফল

এক চোর এক খামারবাড়ি থেকে একটা হৃষ্টপুষ্ট, বড় ভাল জাতের ছাগল চুরি করে বাড়ি এনেছিল। ছাগলটাকে দেখে তো চোরের বউয়ের খুব পছন্দ হল। সে তাকে বলল, "হাট বসতে এখনও তিন চারদিন বাকি। এ-কদিন আমরা ছাগলের দুধ খেতে পাব।"

তার পর হাটের দিনে চোর ভোর রাতে ছাগল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর চলার পর ছাগল চোরটি দেখল, পথের ধারে একটি লোক ঘুমিয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে লোকটার কাপড়ের খুঁটটি খুলে দেখল তাতে একটি সোনার আংটি। আংটি পেয়ে চোর তো আনন্দে আটখানা হল। সে তাড়াতাড়ি ছাগলটাকে সেখানে রেখে দৌড় দিল। অনেক পথ দৌড়ে যাবার পর সে একটা ছোট নদীর ধারে পৌঁছাল। সেখানে সে ভাবলো, নিজের গ্রামে কোন সোনার দোকানে এই আংটিটা বিক্রি করলে চুরির দায়ে ধরা পড়ব। কেননা সবাই জানে আমি গরিব। এই গ্রামের কোন সোনার দোকানে আংটিটা বেশ ভাল দামে বেচে যাই।

এই ভেবে সে নদী পার হয়ে গ্রামের এক সোনার দোকানে গেল। স্বর্ণকার আংটি দেখা মাত্রই অবাক। সে কয়েক

কমল বসু

মাস আগে জমিদারের জন্য ওই আংটিটা তৈরি করেছিল। চেনায় তার ভুল হল না। সে খবর পাঠালো জমিদারের কাছে।

আংটি চুরি যাওয়ায় জমিদারের মন খুব খারাপ ছিল। আংটি ফিরে পাওয়ার সংবাদে জমিদার খুব খুশী হল। জমিদারের কর্মচারীরা চোরের মুখ থেকে কোন কথা শুনল না! সবাই মিলে খুব মার মেরে চোরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

এদিকে সেই গাছতলার লোকটি ঘুম ভাঙ্গতেই দেখল তার কাপড়ের খোঁটে আর আংটি নেই। আংটি চুরি করতে পেরে সে অনেক আনন্দ ও শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় ভ্যাঁ ভ্যা আওয়াজ শুনে দেখল গাছতলায় একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ছাগলটাকে ধরে নিয়ে হাটের পথে চলল। মনে মনে সে হিসেব করতে লাগল কত দাম দিয়ে বিক্রি করবে। সে একটা খামার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ছাগলটা তার নিজের জায়গায় এসে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকল।

ছাগলের ডাক শুনে খামারের মালিক বেরিয়ে এসে চিৎকার করে লোক জড় করে বলল, "এই দেখ আমার ছাগল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ছাগল চোরকে কিল-চড়-ঘুষি মেরে মাথা ন্যাড়া করে গাধার টুপি পরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হল। এই ভাবে দুই চোর চুরি করার শাস্তি পেল।

গোপনে আলোচনা

কোন এক দেশের যুবরাজ মনে কোন প্রশ্ন জাগলেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতো। একদিন বেড়াতে বেড়াতে মন্ত্রীকে সে জিজ্ঞেস করল, "প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারেই আপনি আমার বাবার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করেন কেন ?"

"সময়মত আমি তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেব।" মন্ত্রী বলল।

অন্য একদিন ওরা দুজনে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় মন্ত্রী জোরে জোরে যুবরাজকে বলল, "আজ আমাদের সেনারা আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদত্তের দুজন গুপ্তচরকে বন্দী করেছে।" কাছের কয়েকজন চাকর মন্ত্রীর কথা শুনল।

চাকরগুলো সেদিন রাত্রে রাজা ব্রহ্মদত্তের গুপ্তচর ধরার ঘটনাকে যে যার বউয়ের কাছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলল। একজন বলল, "রাজপ্রাসাদের ভেতরেই গুপ্তচর ধরা পড়েছে। অন্যজন বলল, "এই গুপ্তচর নিয়ে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গোপনে আলোচনা চলছে।" তৃতীয় জন বলল, "ব্রহ্মদত্তের সেনারা আমাদের দেশের সীমান্তে তৈরি হয়ে আছে।" চতুর্থজন বলল, "যুদ্ধ লাগবেই।"

পরের দিন সারা রাজধানীতে সকলের মুখে যুদ্ধের আলোচনা। প্রত্যেকে জিনিসপত্র কিনে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছিল। সেই সুযোগে ব্যবসাদাররা জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিল। শেষে রাজা ঢাঁড়রা পিটিয়ে জানিয়ে দিল যে যুদ্ধের কোন আশঙ্কা নেই। তারপর যুবরাজকে মন্ত্রী বলল, "দেখলে তো, এই জন্যই গোপনে আলোচনা করতে হয়। না হলে লোকে তিলকে তাল করে।"

উপদেশের প্রভাব

শ্রীপুরের পণ্ডিত গোপালাচার্য নিজের বাড়ির আঙিনায় শিষ্যদের পড়াতে বসতেন। নিষ্ঠাভরে পড়াতেন। ফলে তাঁর পাঠশালার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক দূর থেকে ছাত্র এসে তাঁর কাছে পড়ত। একদিন গোপালাচার্য কথায় কথায় ছাত্রদের বললেন, "আমরা একটি ঘটি নিয়ে কুয়োর কাছে অথবা পুকুরের কাছে গেলে আমরা খুব জোর এক ঘটি জল আনতে পারি। সেটাই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের যাত্রা-পথে সোনার পাহাড় অথবা শ্মশান পড়লেও আমাদের ভাগ্যে যা পাওয়ার আছে তাই আমরা পাব। তার বেশি বা কম আমরা পেতে পারি না। পাব না। ভাগ্যের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না।"

এই কথা গোপালাচার্যের কজন ছাত্রের কানে ঢুকল বা মনে গেঁথে গেল বলা যায় না। তবে ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিবরামের কানে গেল। তার মনে কথাটা গেঁথে রইল।

শিবরাম ঐ গ্রামের পূজারীর ছেলে। তার বয়স পঁচিশ বছর হলেও কোন কাজ নিজস্ব উদ্যোগে করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার বাবা তাকে অনেকবার বলেছিল, "বাবা এদিক ওদিক ঘুরে না বেড়িয়ে আমার সঙ্গে মন্দিরে আয়। পূজো করা শিখে নে। একটা কিছু না শিখলে বাঁচতে পারবি না। কথা শোন।" কিন্তু শিবরামের কানে তার কথা ঢুকত না। বাড়ির সবাই তাকে উপেক্ষা করত। সকলের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়ে সে মনের দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল।

এই যাওয়ার সময়েই গোপালাচার্যের কথা তার কানে গেল। সোনার পাহাড়

জগন্নাথ নাথ

পৃথিবীতে আদৌ আছে কিনা, থাকলে কোথায় আছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। তবে শ্মশান যে কোথায় আছে তা সে জানত। শ্মশান সে নিজের চোখে কয়েকবার দেখেছে। শ্মশানে তাকে যেতে হয়েছে কয়েকবার মড়া নিয়ে।

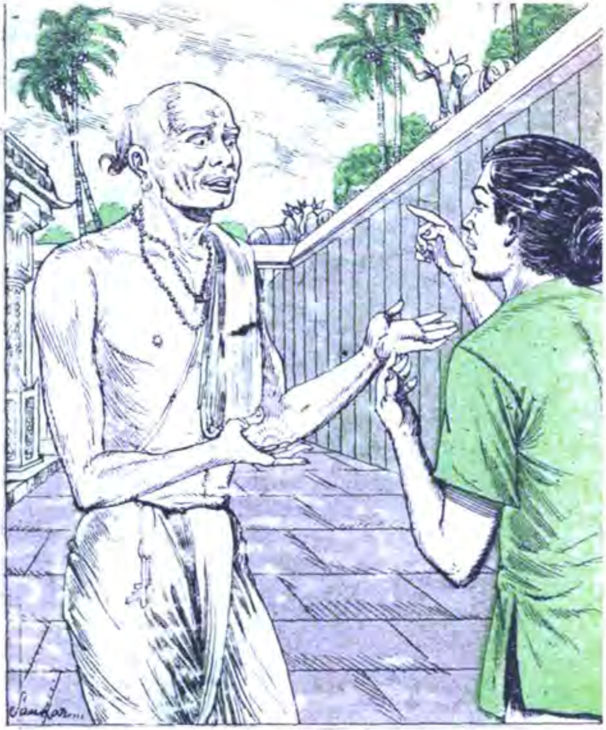

সেই রাত্রে শিবরাম পেট ভরে খেয়ে শ্মশানের দিকে গেল। অন্ধকারে শ্মশানের ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ দেখতে দেখতে একটু এগিয়ে সে দুটো মড়া পুড়তে দেখতে পেল। পাশে একটি মন্দির ছিল। শিব-রাম একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে মন্দিরের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে মনে হল কে যেন তাকে টানছে। তার কাপড় ধরে তাকে এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছে। কিন্তু ঘুমের ঘোরে সে যেন টের পেয়েও চোখ খোলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

সকালে যখন তার চোখে সূর্যের তীব্র আলো পড়ল তখন তার চোখের পাতা নড়ে উঠল। সে চোখ খুলল। চোখ খুলে সে যা দেখতে পেল তাতে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

তার সামনে দুটো সোনার টুকরো পড়ে ছিল। শিবরাম সেই সোনার টুকরো খরচ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাত যখন খালি হয়ে গেল তখন সে আবার শ্মশানে গিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে তার মাথায় নানা চিন্তা দোরাঘুরি করতে লাগল। তার মনে হল কে যেন তাকে কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবু সে জাগল না। সেইভাবে পড়ে রইল। তারপর সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখতে দেখতে পেল তার সামনে দুটো সোনার টুকরো পড়ে রয়েছে। সে ঐ সোনার টুকরো দুটো নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

এই খবর একান ওকান হয়ে গোপালা-চার্যের কানে গেল। তিনি আরও জানতে পারলেন যে শিবরামের এইভাবে সোনার টুকরো পাওয়ার পিছনে তাঁর উপদেশই

মুখ্য কারণ। তাঁর উপদেশ মত চলার ফলেই সে ঐ সোনা পেয়েছে। তিনি ভাবতেই পারলেন না যে তাঁর উপদেশ মত চলে কেউ এতখানি উপকৃত হতে পারে।

গোপালাচার্য শিবরামকে ডেকে পাঠা-লেন। তিনি শিবরামকে বললেন, "আমার উপদেশ মত চলার ফলেই তুমি যখন সোনার টুকরো পেয়েছ তখন সবটাই তোমার কি নেওয়া উচিত ?"

"না উচিত নয়। আমি এক্ষুণি আপনার অংশ এনে দিয়ে যাচ্ছি।" বলে শিবরাম উঠে পড়ল।

"না, আমাকে দিতে হবে না। তুমি আমাকে ঐ জায়গাটা দেখিয়ে দাও যেখানে তুমি দু দুবার সোনা পেয়েছিলে।" গোপালাচার্য বলল।

সেই রাত্রেই শিবরাম গোপালাচার্যকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শ্মশানের সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। সেই রাত্রে গোপালাচার্য ঘুমিয়ে পড়ল শ্মশানে। ঘুমিয়ে পড়ার পর তার মনে হল কে যেন তার কাপড় ধরে টানছে। ঝটপট উঠে পড়লেন তিনি। তারপর আর তিনি সারারাত ঘুমোতে পারেন নি। সকালে উঠে সামনে এপাশে ওপাশে ঘুরে দেখলেন কোথাও সোনার টুকরো নেই।

পরের দিন রাত্রে আবার গোপালাচার্য সেখানে ঘুমালেন। মাঝ রাত্রে তার মনে হল কে যেন তাকে কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটাচ্ছে। তাতে তাঁর ভয় করল। তাঁর মনে জাগল আতঙ্ক।

তাঁর মনে হল কে যেন তাঁকে শ্মশানের চিতের উপর বসিয়ে পোড়াচ্ছে। তাঁর শরীর জ্বলছে। গোপালাচার্য আর সহ্য করতে না পেরে উঠে পড়ে সোজা বাড়ি ফিরে এল। সকালে গোপালাচার্য ভাবলেন, "হয়ত আমার কপালে এই আছে! শুধু এক ভয়ঙ্কর স্বপ্নই আমার প্রাপ্য।"

মহাভারত

পরশুরাম বহু বছর তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, নিয়ম পালন, পূজা, হোম, ইত্যাদির দ্বারা দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করলেন। তখন শিব বললেন, "ভার্গব, তুমি জগতের কল্যাণের জন্য এবং আমার আনন্দের জন্য দেবতাদের শত্রুদের ধ্বংস কর।"

পরশুরাম বলেছিলেন, "হে দেবেশ, আমার এমন কি শক্তি আছে যার দ্বারা এ কাজ করব ? আমি অস্ত্রশিক্ষা পাইনি। কি প্রকারে তাদের আমি বধ করব ?"

তখন মহাদেব বলেছিলেন, "তুমি আমার আদেশ ও আশীর্বাদে সকল প্রকার গুণের অধিকারী হবে। যাও জয়লাভ করে ফিরে এসো।"

শিবের আজ্ঞায় পরশুরাম দৈত্যদের যুদ্ধে আহ্বান করে বজ্রসম অস্ত্রের আঘাতে তাদের নিধন করলেন। যুদ্ধ করতে করতে পরশুরামের শরীরে আঘাত লেগেছিল। মহাদেব খুশী হয়ে বলেছিলেন, "ভৃগুনন্দন, দানবদের অস্ত্রের আঘাতে তোমার শরীরে যে কষ্ট সৃষ্ট হয়েছিল, তার ফলে মানুষ হিসেবে তোমার যে কর্তব্য ছিল তা শেষ হয়েছে। এখন তুমি তোমার আকাঙ্খিত অস্ত্র নিয়ে নাও।"

তারপর পরশুরাম নিজের ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র নিয়ে মহাদেবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন। পরে পরশুরাম খুশী হয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমগ্র ধনুর্বেদ

দান করেছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তাহলে পরশুরাম তাঁকে সেই মহা অস্ত্র দান করতেন না। আর এই সব কারণেই দুর্যোধন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে কর্ণ সূত পুত্র।

মৃতজনের উদ্দেশ্যে তর্পণের পরে পাণ্ডবগণ অশৌচ মোচনের জন্য গঙ্গাতীরে এক মাস বাস করেছিলেন। তখন নারদ, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সকলেই পাণ্ডবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বললেন, "আমি ব্রাহ্মণদের কৃপায় এবং কৃষ্ণ আর ভীম ও অর্জুনের শৌর্যে পৃথিবী জয় করেছি। কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার জ্ঞাতিগণ ও পুত্রদের হারিয়ে আমার এই জয় পরাজয়ের মতই মনে হচ্ছে। কর্ণ যে আমাদের ভাই তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু আমাদের মাতা কর্ণকে জানিয়েছিলেন তাঁর পরিচয়। কিন্তু কর্ণ নিজ পরিচয় পেয়েও কৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারেন নি। আমাদের সেই ভাই অর্জুনের দ্বারা নিহত হয়েছেন। দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ্যূতসভায় আমাদের রূঢ় বাক্য বলেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে আমাদের মায়ের চরণের সাদৃশ্য দেখতে পাই। এতে আমার রাগ অনেক শান্ত হয়েছিল। কিন্তু চরণের এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কিছুই বুঝতে পারিনি।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দেবর্ষি নারদ কর্ণের জন্ম ও তাঁর অস্ত্রশিক্ষার সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে বললেন, "দুর্যোধন কর্ণের বাহুবলের সাহায্যেই কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করেছিলেন। তারপর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজিত করলে জরাসন্ধ আনন্দিত হয়ে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী তাঁকে দান করেছিলেন। আর চম্পা নগরী পালনের ভার পেয়েছিলেন দুর্যোধনের

কাছ থেকে। তাছাড়া পরশুরাম ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিসম্পাত করেছিলেন। ইন্দ্র কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন। ভীষ্ম অপমাণিত হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলেছেন। শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে আর কেশবের কূটনীতির ফলেই কর্ণ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। এভাবে তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।"

শোকাগ্রস্ত যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ ও ক্রোধকে ধিক্, যে জন্য আজ আমাদের এই বিপদ হলো। জয় আমাদেরও হয়নি, দুর্যোধনেও হয়নি। তাঁকে বধ করার ফলে আমাদের রাগ ও ক্ষোভ দূর হয়েছে সত্যি কিন্তু আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। আমি শোকতপ্ত মন নিয়ে বড় পীড়িত হচ্ছি।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "ধনঞ্জয় তুমিই রাজসিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন কর। আমি তপস্যায় রত থাকব।"

সহিষ্ণুতার সীমা যেন অর্জুনের ছাড়িয়ে গেল। ক্ষোভে, অভিমানে, দুঃখে, ক্রোধে তিনি বললেন, "এত কষ্ট, এত ত্যাগ স্বীকার করে যা আমরা আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছি, তা আপনি ত্যাগ করতে চাইছেন? এখন কি আমাদের অলসতার অবকাশ আছে? আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি রাজকুলে জন্মেছেন। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে আপনি যে মাটি জয় করেছেন আবেগের বশবর্তী হয়ে তা ত্যাগ করে আবার বনে গিয়ে অসহায় জীবন যাপন করতে চান? লোকে যে হাসবে। আমরা কি দেবতার চেয়ে বড়? দেবতারা কি তাঁদের জ্ঞাতি অসুরদের বধ করে সম্পদ বৃদ্ধি করেন নি। আপনি যদি আজ আপনার কর্তব্য না করেন তাহলে মহাপাতকের কাজ করবেন।"

ভীম অর্জুনকে সমর্থন করে বললেন, "আপনি রাজধর্মের অহেতুক নিন্দা করছেন। শত্রুকে বিনাশ করার মধ্যে কোন রকম দয়ার স্থান নেই। হিংসার কথা বলছেন? এত বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে

দুর্যোধনকে যে বধ করা হল তা কি আবার বনে ফিরে যাবার জন্য ? একথা আগে জানলে অস্ত্র ধারণ করার কোন প্রয়োজনই হত না। এত বড় একজন জ্ঞানী পুরুষ হয়েও যদি আপনি ক্লীবের মত আচরণ করতে চান তাহলে তার চেয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনার বিষয় কিছু হতে পারে না।"

অর্জুন ও ভীমের পর তাঁর সমর্থনে নানা কথায় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য শাসনের ভার নিতে বললেন।

এত কথার পরেও যখন যুধিষ্ঠির মন-স্থির করতে পারছিলেন না রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তখন দ্রৌপদী বললেন, "মহারাজ, আপনার ভাইয়েরা চাতক পাখির মত শুকনো গলায় আপনাকে অনেক কথা বলেছেন। আপনি তাঁদের সঠিক উত্তর দিয়ে খুশী করছেন না। আপনাদের কর্তব্য আমার যাতে সুখ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।"

যুধিষ্ঠিরের মনে পড়তে লাগল অনেক কথা। বনবাসে ও যুদ্ধক্ষেত্রে তার ভাই-দের কম কষ্ট সহ্য করতে হয়নি।

অর্জুন আবার বললেন, "মহারাজ, যোগ্য রাজাই দেশের সম্পদ। যোগ্য রাজা না থাকলে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে দেশবাসীর অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। বৃহত্তম স্বার্থে আপনি আর বিলম্ব না করে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করুন। এখন আর ত্যাগের সময় নয়; ভোগের সময়। যজ্ঞ করুন, দান করুন। প্রজাপালন ও শত্রুনাশ এই দুটো কর্তব্যই করতে হবে।"

পরক্ষণেই ভীম বললেন, সমস্ত শাস্ত্রই তো আপনার অধীত। কেন যে এই মোক্ষম মুহূর্তে এত ভাবছেন, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। পিতৃ-পিতামহ যেভাবে শাসন করেছেন, যজ্ঞ করেছেন আপনিও তাই করুন।"

ভীমের কথায় যুধিষ্ঠির কিছু না বলে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "দেখ ভীম, যারা অজ্ঞ একমাত্র তারাই

এমন কি উদর পুরণের জন্যও হিংসার আশ্রয় নেয়। শত্রুকে জয় করা যেমন প্রয়োজন উদরের নিয়ন্ত্রণও দরকার।"

তারপর অর্জুনের দিকে ঘুরে যুধিষ্ঠির বললেন, "দেখ অর্জুন, দু-রকমের বেদ রচনা আছে। বেদে কর্ম করার যেমন নির্দেশ আছে, কর্ম পরিহার করারও নির্দেশ আছে। স্বীকার করি যুদ্ধশাস্ত্রে তুমি বিজ্ঞ। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে ঢোকার চেষ্টা করো না। যাঁরা মোক্ষ লাভ করেন, তাঁরা ত্যাগের মাধ্যমেই লাভ করে থাকেন।"

এরপর ঋষিগণ নানা কথা বলে যুধিষ্ঠির-কে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "যদি কেউ আমাদের বধ করতে আসে, তখন তাকে বধ করা পাপ নয়। তাতে দোষ হয় না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আমি কি করে ভুলবো যে, আমি যাঁর কোলে বসে খেলা করেছি, সেই ভীষ্মের পতনের মূলে আমিই রয়েছি। আমার মিথ্যা কথার জন্যই কি দ্রোণ বিনষ্ট হন নি? আমিই যে ভ্রাতা কর্ণকেও বধ করিয়েছি সেকথা কি ভুলতে পারি! রাজ্যলোভেই কি বালক অভিমন্যু প্রাণ দেয়নি? না খেয়ে এই শরীরটাকে শেষ করে দেব।"

তারপর ব্যাসদেব বিভিন্ন ধরণের পাপ কাজ ও প্রত্যেকটি পাপ কাজের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিবৃতি দিলেন।

কৃষ্ণ বললেন, "ব্যাসদেব যা বলেছেন আপনি তাই করুন। আপনার অপেক্ষায় উদগ্রীব ও উৎকন্ঠিত হয়ে রয়েছে আপনার অধীন রাজারা। আপনি আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য রাজপদ অলঙ্কৃত করুন।"

ভাইদের কথা শুনে, কৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের উপদেশ অনুধাবন করে যুধিষ্ঠিরের অনুশোচনা দূর হল। কর্তব্য স্থির করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রথ তৈরি ছিল। রথ টানার জন্য ষোলটি বলদ প্রস্তুত ছিল। লাগাম ধরে ভীম সারথির স্থানে বসলেন। অর্জুন সাদা ছাতা যুধিষ্ঠিরের মাথায় ধরলেন। নকুল ও সহদেব তাঁর জন্য চামর ধারণ

করলেন। যুধিষ্ঠিরের রথের পেছনে যুযুৎসুর রথ এগোতে লাগল। তার পেছনে ছিল কৃষ্ণ ও সাত্যকির রথ। এই মিছিলের সামনে ছিলেন গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, কৌরব নারীগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রমুখ। আলাদা আলাদা বাহনে বিদুরের সঙ্গে এঁরা এগোতে লাগলেন। এইভাবে সুসজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুরে পৌঁছালেন তখন প্রজা-দের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ দেখা দিল। চারদিকে সাদা ফুলে তোরণ সজ্জিত ছিল।

পথের দুই ধারে নরনারী হাত তুলে নিজেদের আনন্দ সরবে প্রকাশ করছিল। যুধিষ্ঠিরও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করলেন।

এই ভীড়ের মধ্যে দুর্যোধনের বন্ধু চার্বাক রাক্ষস ভিখারীর ছদ্মবেশে শিখাদণ্ড ও জপমালা ধারণ করে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণদের অনুমতি না নিয়েই সে চিৎকার করে বলল, "কুন্তীপুত্র, এরা আমার উপর ভার দিয়েছেন তোমাকে বলতে, তুমি জ্ঞাতি হন্তা, তুমি কু-নৃপতি, আত্মীয় স্বজনকে মেরে ফেলে তুমি সুখ ভোগ করতে যাচ্ছ। তোমার পক্ষে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় ছিল।"

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, "আপনারা অনুগ্রহ করে আর আমাকে ধিক্কার দেবেন না। আমি মাথা নত করে বলছি আমার মৃত্যু আসন্ন।"

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ বলে উঠলেন, "মহারাজ, চার্বাকের কথাকে আমাদের কথা হিসেবে ধরবেন না। এই লোকটা দুর্যোধনের বন্ধু ছিল। আপনার বা আপনার ভাইদের কোন দোষ নেই।"

একথা বলে ওরা হুঙ্কার দিয়ে উঠল এবং চার্বাককে বধ করল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে আবার মানসিক অশান্তি জেগে উঠেছে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "মহারাজ, সত্য-যুগে চার্বাক বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে অভয় বর লাভ করে-ছিলেন। বর পেয়ে এই পাপীটা দেবগণের উপরও অত্যাচার করতে লাগল। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তখন ব্রহ্মা

বলেছিলেন, ভবিষ্যতে চার্বাক কোন এক রাজা দুর্যোধনের বন্ধু হবে। সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণদের অপমান করবে। তখন ব্রাহ্মণরা রেগে গিয়ে চার্বাককে শেষ করে ফেলবে।”

তারপর যুধিষ্ঠির কর্তব্যে ব্রতী হলেন। স্বর্ণময় পীঠে পূব দিকে মুখ করে বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সামনে বসলেন। ভীম ও অর্জুন আসন গ্রহণ করলেন তাঁর দুই পাশে। নকুল ও সহদেবের সঙ্গে কুন্তী অন্য একাসনে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসন গ্রহণ করলেন যুযুৎসু আর সঞ্জয়। যথাবিধি হোমাগ্নি শুরু হল। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন। ধৃতরাষ্ট্রও জলসেক করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিলেন। তাঁরা আনন্দিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, “আমরা ধন্য, কারণ ব্রাহ্মণগণ আমাদের গুণকীর্তন করেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং পরম দেবতা। আমাকে যারা ভালবাসো তারা ধৃতরাষ্ট্রকে আগের মতই শ্রদ্ধা করবে।”

প্রজাদের বিদায় দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে যুবরাজ ও বিদুরকে মন্ত্রী হিসেবে ঘোষ করলেন। সঞ্জয়ের উপর ভার দিলেন আয় ব্যয়ের হিসেব রাখা ও কর্তব্য নির্ধারনের নকুলকে ভার দিলেন সেনা তত্ত্বাবধানের। অর্জুনের উপর ভার পড়ল শত্রু রাজাদের ও দুষ্টদের দমন করার। সহদেবের উপর ভার পড়ল তাঁকে রক্ষা করার। এই সব কাজ সেরে যুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যবস্থায় মন দিলেন। ভূ-দান করলেন ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রদের। যুধিষ্ঠির দ্রোণ, কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ ও অভিমন্যুর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। এছাড়া বহু মৃত যোদ্ধাদের নামে ধর্মশালা গঠিত হল, সরোবর তৈরি হল। তারপর যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসনের কাজে ধীর স্থির চিত্তে ব্রতী হলেন।

মিত্র-ভেদ

নয়

দমনক করটককে কাকের কাহিনী শুনিয়ে বলল, "দেখলে তো কাক কিভাবে বুদ্ধিবলে সাপকে মেরে ফেলল ? বুদ্ধির শক্তিই দুনিয়ায় সমস্ত শক্তির চেয়ে বড় শক্তি। বুদ্ধি দিয়ে কিভাবে একটি খরগোশ বিরাট এক অহঙ্কারী সিংহকে মেরে ফেলল সে কাহিনী জান ?"

"না তো ? শোনাও।" করটক বলল। দমনক শুরু করল সে কাহিনী।

ছায়া দেখিয়ে মেরে ফেলা

প্রাচীন কালে কোন এক বনে ভাসুরক নামে এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সিংহ ছিল। শক্তির প্রতাপ দেখিয়ে সে ঐ বনের হরিণ থেকে শুরু করে খরগোশ পর্যন্ত যা পেত তাই খেত। পেট ভরে গেলে অহেতুক থাবা মেরে কয়েকটা জন্তু জানোয়ারকে মেরে ফেলত। একদিন বনের সমস্ত হরিণ মোষ খরগোশ প্রভৃতি জন্তু গোপনে এক জায়গায় জড় হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিংহের কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, অনুগ্রহ করে আপনি আর আমাদের এভাবে এলোপাতাড়ি মেরে ফেলবেন না। আপনার খিদে মেটানোর জন্য প্রত্যেকদিন একটি করে জানোয়ার উপহার দিয়ে যাব। আমরা আপনার প্রজার মত। যে গরুর দুধ দুয়ে নেয় সে সব দুধ নেয় না, বাছুরকেও খেতে দেয়। তার ফলে বাছুরও একদিন বড় হয়ে দুধ দেওয়া শুরু করে। ঠিক এই ভাবে চললেই রাজা ভাল ভাবে রাজত্ব চালাতে পারে। আর যে

গরুর দুধ দোয়া হয়, তাকেও খেতে দেওয়া হয়। না খেলে গরু দুধ দেবে কোত্থেকে। একটি ছোট্ট বীজ মাটিতে পুঁতে সময় মত জল দিলে তবে তো সময়মত ফল দেবে গাছ হয়ে। ঠিক তেমনি রাজার কাছে প্রজারাও একটি গাছের মত। রাজা যদি প্রজাদের না দেখে তাহলে কে দেখবে।”

“তোমরা মন্দ বল নি। ঠিক আছে আমি তোমাদের শর্ত মেনে নিচ্ছি। তবে মনে রেখো একদিনও যদি কামাই হয়, একদিনও যদি আমি খেতে না পাই, তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে সাবাড় করে দেব।” সিংহ জবাবে বলল।

অন্যান্য জন্তুগুলো সিংহের হুঁশিয়ারী শুনে প্রতিজ্ঞা করে বলল যে তারা তাদের কথামত কাজ করবে।

সেদিন থেকে প্রত্যেক জন্তু-জানোয়ার নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কারণ তারা জানে যে সিংহ তাদের দেখলেও কিছু করছে না। অন্যদিকে প্রত্যেকদিন একটি করে জানোয়ার সিংহের পেটে যেতে লাগল। একদিন খরগোশের পালা এল। সিংহের পেটে যেতে হবে ভাবতেই তার দুঃখের সীমা রইল না। অন্য জন্তু-গুলো যখন আজকে তাকেই পাঠাবে ঠিক করেছে তখন আর না গিয়েও উপায় নেই। এক-পা এক-পা করে সে সিংহের দিকে এগোতে লাগল আর ভাবতে লাগল কিভাবে সিংহকে মেরে ফেলা যায়।

ওদিকে সিংহের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সে অস্থিরভাবে হাঁটছে আর এদিক ওদিক তার খাবার আসছে কিনা দেখছে। এদিকে খরগোশ ভাবছে, “আজ এই ক্ষুধার্ত সিংহকে যে কোন ভাবে মেরে ফেলতে হবে। কথায় আছে বুদ্ধি-মান যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যা করব বলে ঠিক তা করে।”

একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে খরগোশ এগোচ্ছিল। তার চোখে পড়ল একটি কুয়ো। সে কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে জল

দেখল। মুহূর্তে তার মনে একটি উপায় জাগল। সে মনে মনে বলল, "এই তো পেয়েছি! এই কুয়োর জলেই সিংহকে ডুবিয়ে মারার উপায় পেয়ে গেছি।"

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সিংহের কাছে যেতে খরগোশের দেরি হয়ে গেল। সময়মত খেতে না পেয়ে সিংহ খিদের জ্বালায় গর্জন করতে লাগল। সে খরগোশকে দেখেই দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আর তোমাকে আসতে হবে না। কাল তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলব।"

তা সত্ত্বেও খরগোশ সিংহের কাছে এসে প্রণাম করল। খরগোশের এই আচরণে সিংহ আরও রেগে গিয়ে বলল, "তোমাকে খেয়ে তো আমার খিদে একদম মিটবে না। কিন্তু তার আগে বল তুমি কেন দেরি করে এসেছ? তোমার এই দেরির ফলে তোমাদের সবাইকে আমি কাল শেষ করে ফেলব।"

খরগোশ আর একবার প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, আসতে যে দেরি হল তার জন্য আমি বা অন্য জন্তু দায়ী নই। অন্য জন্তুরা আজকে পাঁচটিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। কারণ ওরা ভাল ভাবেই জানত যে একটি খরগোশ পাঠিয়ে আপনার একটুও খিদে মেটানো যাবে না। আমরা পাঁচজনে মিলে আপনার কাছে

আসছিলাম। পথে গর্ত থেকে আপনার চেয়ে অনেক বড় একটা সিংহ বেরিয়ে এসে আমাদের বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তোমাদের আর কোত্থাও যেতে হবে না। আর কিছুক্ষণ পরেই তোমরা আমার পেটে যাবে। তখন বললাম, আমাদের রাজার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে সেই অনুসারে আমরা তাঁর খিদে মেটাতে যাচ্ছি। তুমি আমাদের কেউ নও। আমরা আমাদের রাজাকে চিনি। আমাদের বাধা না দিয়ে যেতে দাও। আমাদের রাজা রেগে যাবেন। তখন সে বলল, কে তোমাদের রাজা? ঐ ভাসুরক? যাকে আমরা চোর বলে জানি? ওসব হবে না! এই বনে থাকতে হলে

আমার কথামত চলতে হবে। তোমার রাজার যদি ক্ষমতা থাকে আমার সঙ্গে লড়ে জিতে যেন বাহাদুরী দেখায়। আপনাকে এই কথা জানাবার জন্যই ঐ সিংহ একা আমাকে পাঠিয়েছে। ঐ চারজন যদি আসত তাহলে পাঁচজনকে দেখে আপনি হয়ত রাগ করতেন না। আর ঐ সিংহ বাধা না দিলে আমরাও নিশ্চয় সময়মত আপনার কাছে পোঁছে যেতাম।"

একথা শুনে সিংহ বলল, "চুলোয় যাক আমার খাবার। চল আগে দেখে আসি কে তোমাদের এই কথা বলেছে। আমি এক্ষুণি ঐ সিংহের মোকাবিলা করতে চাই। আমার রাজত্বে বাস করে সে আমার বিরুদ্ধেই লড়তে চায়? চল এক্ষুণি তাকে শেষ করে আসি।"

খরগোশ বলল, "মহারাজ, শত্রুর ক্ষমতা না জেনেই তাকে আক্রমণ করতে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

"তোমাকে যা বলছি তাই কর। চল দেখিয়ে দাও।" সিংহ গর্জে উঠল।

খরগোশ সিংহকে সঙ্গে করে সেই কুয়োর কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে বলল, "এই গর্তেই ঐ সিংহটা থাকে মহারাজ।" তারপর খরগোশ ঐ কুয়োতে একটু ঝুঁকে দেখে নিয়ে সিংহকে বলল, "মহারাজ, আপনার আসার খবর হয়ত এই সিংহটা আগেই জেনে গেছে। ভয়ে গুটিয়ে আছে।"

মূর্খ সিংহ কুয়োতে ঝুঁকে দেখল। নিজের প্রতিবিম্বকে অন্য একটা সিংহ ভেবে গর্জন করল। তার গর্জনের প্রতিধ্বনি শুনে সে ঐ সিংহের গর্জন ভেবে কুয়োতে লাফ দিল এবং মারা গেল।

খরগোশের কাছ থেকে সিংহের মারা যাবার খবর পেয়ে বনের সমস্ত জন্তু-জানোয়ার আনন্দে নাচতে লাগল। সেদিন তারা উৎসব পালন করল এবং ওরা বাকি জীবন আরামে কাটাতে পারল।

নিউক্লিয়ার ডুবোজাহাজ 'স্কেট'

আজকের দিনে অনুশক্তির দ্বারা চালিত ডুবোজাহাজ বহু দেশে আছে। স্কেট নামক এক ডুবোজাহাজ আমেরিকা তৈরি করেছিল। অণুশক্তিতে চালিত ডুবোজাহাজ জলের তলা দিয়ে অনেক দেশ ঘুরে আসতে পারে। অন্য ইন্ধনে চলে না।

স্কেটের বিশেষ ক্ষমতা এই যে সে উত্তর মেরুর বরফাঞ্চলে যাত্রা করে ১৯৫৯ সালের ১৭ই মার্চ একেবারে বরফ ফুঁড়ে উপরে উঠে আসতে পেরেছিল। সেই অঞ্চলের বরফের গভীরতা যে কত তা গোপন রাখা হয়েছে।

উত্তর মেরুর বরফাঞ্চলে পৌঁছাতে ডুবোজাহাজটিকে চার হাজারেরও বেশি মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই যাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা একশো ছ'জন।

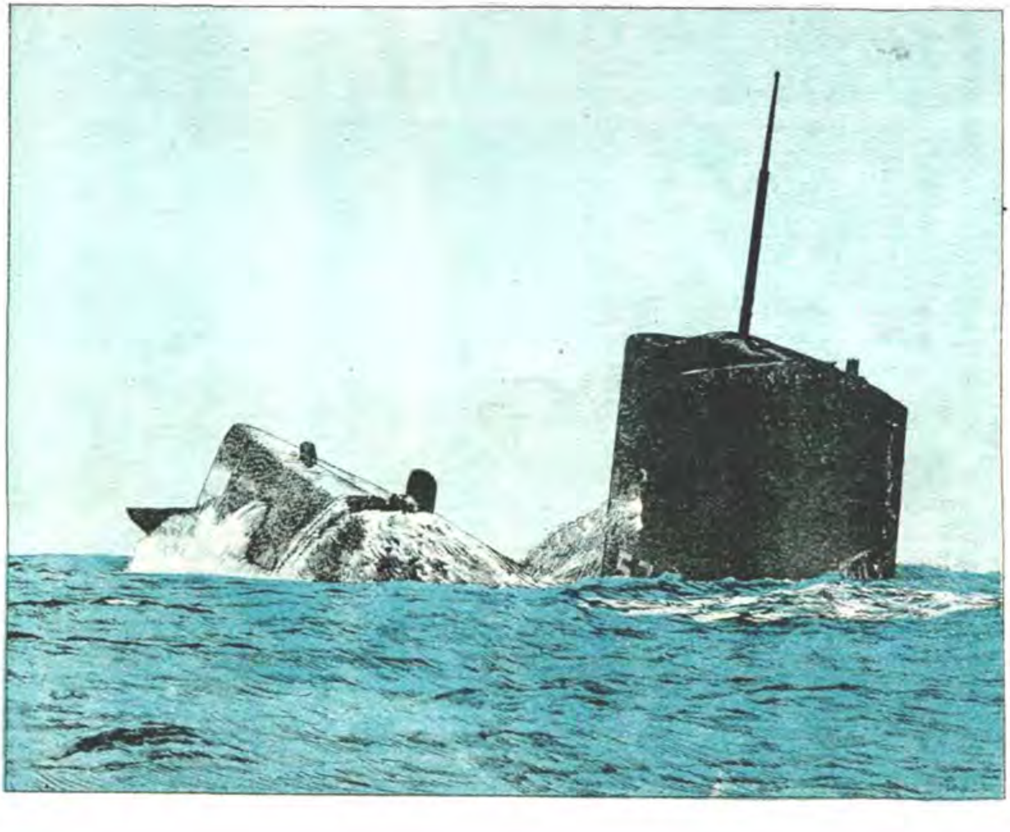

ফটো : এস. জি. শেষগিরি

পুরস্কৃত
নাম

একার আকাশ দেখার আশা

পুরস্কার পেলেন
বকুল দে

ফটো ঃ এস. জি. শেষগিরি

১২।২ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

নিজেকে জলের ছায়ায় আঁকা

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে মে '৭৪-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো জুলাই '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

অমরবাণী	৮	যোগ্যতার প্রমাণ	৩৮
যক্ষপর্বত	৯	চুরির ফল	৪৩
পরিবেশের প্রভাব	১৭	উপদেশের প্রভাব	৪৬
মোমবাতির বিচার	২৪	মহাভারত	৪৯
ক্ষুধার ওষুধ	২৯	মিত্রভেদ	৫৭
তিনকড়ির পুণ্য	৩৩	বিশ্বের বিস্ময়	৬১

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

মহীশূরের নর্তকী

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

ভাঙ্গরা নাচ

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

Photo by : SURAJ N. SHARMA

BHANGRA DANCE

মিত্রভেদ